আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার অষ্টপঞ্চাশৎ গ্রন্থ

বোঝাপড়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

অগ্রহায়ণ, ১৩২৭।

প্রিণ্টার — শ্রীবিহারীলাল নাথ,
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ

শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মিত্র

৯নং গৌরমোহন মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা।

ভাই অক্ষয়, তোর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব যেন চিরদিন আমার কাছে অক্ষয় হ'য়ে থাকে এই কামনা ক'রে, তোর হাতেই আমার এই প্রথম বইখানা দিলুম।

নরেন।

ফর্দ্দ

১। বোঝাপড়া ... (ভারতবর্ষ।) জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬

২। চতুর্ব্বেদাশ্রম ... (উপাসনা।) অগ্রহায়ণ ১৩২৫

৩। দীক্ষা ... (সঙ্কল্প।) ফাল্গুন, চৈত্র ১৩২১

৪। মাহিদা ... (ভারতবর্ষ।) ভাদ্র ১৩২২

৫। অঘটন ... (ভারতবর্ষ।) বৈশাখ ১৩২৫

৬। গোলাপের জন্ম ... (প্রবাসী।) কার্ত্তিক ১৩২০

বোঝাপড়া

১

দীনু যেদিন স্ত্রীর প্ররোচনায় জ্যেষ্ঠের বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও দাদার বিনানুমতিতেই পৃথক্ হইয়া গেল, স্নেহশীল বৃদ্ধ রাধানাথের অভাব-ঝঞ্ঝাহত বুকখানা সেদিন সেই কঠিন আঘাতে চুরমার হইয়া গেল। দেহের খানিকটা হঠাৎ কোথাও ধাক্কা লাগিয়া প্রবল ঘর্ষণে চিরিয়া গেলে, তীব্র যন্ত্রণার সহিত তাহা হইতে যেমন ঝর্-ঝর্ করিয়া রক্ত পড়ে, রাধানাথের চক্ষের জল সেদিন তেমনই যাতনার সহিত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

রাধানাথের স্ত্রী ক্ষ্যান্তমণি আপন বস্ত্রাঞ্চলে স্বামীর চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "চুপ কর, কেঁদে আর কি হবে ; বেটাছেলে যদি মেগের বশ হয়, তবে কি তার আর বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল থাকে গো ? রাঙা-বৌ আন্‌বো প্রিতিজ্ঞে করে বসেছিলে,—অতগুনো টাকা মহাজনের কাছে হাওলাত করে পণ দিয়ে শেষ কোন্ এক হা'ঘরের মেয়ের কটা চামড়া দেখে বৌ করে নিয়ে এলে,—ছোটনোকের মেয়ে সেয়ানা হয়ে তোমার হাতে-গড়া সংসারটা ভেঙ্গে দিয়ে চলে গেল ! বেশ হয়েছে,—

তুমি যেমন অবুঝ মানুষ, তেমনি তোমায় জব্দ করে গেল ঐ একটা চাষার মেয়ে এসে। সেই বিয়ের সময়েই তখন এই মাণ্‌কের মা দশবার ক'রে বলেছিল, হ্যাঁগা!—টাকাপয়সা হাতে নেই, ধার-কর্জ্জ করে এত সব করা কেন? তা সে কথা তখন কাণেই নিলে না—!" স্ত্রীর কথায় এই আঘাতের বেদনার মধ্যেও রাধানাথের হাসি আসিল; রাধানাথ বলিতে লাগিল, "মাণ্‌কের মা! সেদিন তুই কোথায় ছিলি রে? সেই তিরিশ বছর আগে যেদিন মুমূর্ষু বাপ আমায় তাঁর মরণশিয়রে ডেকে সাতবছরের দীনুকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে বলে যান, 'দেখিস্ বাবা! আমার দীনু যেন না কষ্ট পায়, বেচারী জন্মাবধি মা-হারা, ভাইটিকে তোর সাধ্যমত যত্ন করিস্ রাধু'—তখন আমার বয়েস কত জানিস্, মাণ্‌কের মা! সবে ১৬।১৭ বছর! ঐ কামারদের 'নেদোর' মতন অতটুকু গ্যাঁড়গেড়েটা পানা ছিলুম। তুই এসে দীনুকে যতবড়টা দেখিছিলি—তার চেয়ে বছরটাক বড় আর কি,—সেই বয়সে কি করে যে জোতজমা বাঁচিয়ে, ক্ষেতখামার চালিয়ে অনাথ ভাইটিকে মানুষ করিছিলুম, তা তুই কি ক'রে জান্‌বি? ধার করেছিলুম কি সাধে রে! ভাইকে যে আমার তালুক করে গড়েছিলুম! সে মনে কল্লে বিশ দিনে আমার বিশ বছরের দেনা মিটিয়ে দিতে পার্‌তো! কিন্তু যার অদৃষ্টে সুখ নেই, তার কি কখন ভাল হয় রে? তার সাক্ষী দেখ্ না, অমন লক্ষ্মণ ভাই আমায় ত্যাগ করে চলে গেল!"

রাধানাথের স্ত্রী ক্ষ্যান্তমণি ওরফে মাণ্‌কের মা নিজেও এবার কাঁদিয়া ফেলিল; চোখ মুছিতে-মুছিতে বলিতে লাগিল, "অবাক্ হয়েছি গো! সেই ঠাকুরপো—যে দাদা বল্‌তে, বৌঠান বল্‌তে অজ্ঞান হ'ত—তার যে একদিন এমন মতিগতি হবে, এ স্বপ্নেও ভাবিনি! বৌ-ছুঁড়ি যে তার কাণে কি বিষ-মন্ত্র দিলে! তুমি একগলা দেনায় ডুবে এতকাল ধরে যে ভাইকে রাজা করে গড়লে, সে কি না তোমার বয়েসকালে তোমায় ভাসিয়ে দিয়ে গেল! ছি—ছি! এতটা অধর্ম্ম কি সইবে—" বাধা দিয়া রাধানাথ গর্জ্জিয়া উঠিল, "খবর্দ্দার মাণ্‌কের মা! ভাইকে আমার গাল-মন্দ করিস্‌নে!"

২

তাহার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জমিজমা লইয়া ছোট ভাই দীনুর সহিত মাম্‌লা-মকর্দ্দমা করিতে রাধানাথ কিছুতেই সম্মত হয় নাই। পাড়া-প্রতিবাসী, আত্মীয়-বন্ধু সকলের কথাই সে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার নিজের অনেক ন্যায্য প্রাপ্যও, দীনু আসিয়া দাবী করিবামাত্রই বিনা আপত্তিতে ছাড়িয়া দিয়াছে। গাঁয়ের লোকের পরামর্শে মাণ্‌কের মা যতবার রাগারাগি, কান্নাহাটি করিবার চেষ্টা করিয়াছে, রাধানাথ তাহাকে বুঝাইয়াছে, "ভগবানকে ডাক দে বউ! 'মাণ্‌কে' রইল, 'মতি' রইল—আর তোর ভাব্‌না কিসের? দু'দশ বিঘে জমি নিয়ে কি ধুয়ে খাবি?

আমি ত' আর পরের হাতে তুলে দিই নি রে—দীনুর থাক্‌লেও যা, আমার থাক্‌লেও তা, তবে আর দুঃখটা কি? দীনু কি আমাদের পর রে?"

দীনু পৃথক্ হইবার পর হইতে ক্রমাগত দুই বৎসর ধরিয়া, এই স্নেহান্ধ লোকটিকে কলিযুগের হালচাল ও তদনুরূপ বৈষয়িক বুদ্ধির উপদেশ করিতে বারংবার অপারগ হইয়া, মাণ্‌কের মা সম্পত্তি বাঁচাইবার হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল বটে; কিন্তু স্বামীর শারীরিক সুস্থতার জন্য শীঘ্রই তাহাকে চিন্তিত হইয়া উঠিতে হইল। আশৈশব বহু ঝড়ঝাপটা মাথায় বহিয়া অকুতোভয়ে এই লোকটি আজ পঞ্চাশের কোটায় আসিয়া পা' দিয়াছিল বটে, কিন্তু যে খুঁটির উপর ভর রাখিয়া সে তাহার পরিশ্রান্ত জীবন-সন্ধ্যার ক্লান্তি দূর করিবে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, সহসা সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে চাহিয়া দেখিল, তাহার সেই একান্ত নির্ভরটুকু অন্যে আসিয়া দখল করিয়া লইয়াছে। একে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাহার সে অপরিমেয় শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছিল, তাহার উপর সহসা দীনুর এই অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত আচরণ যখন কঠোর বজ্রাঘাতের মত তাহার বুকের ভিতর আসিয়া বাজিল, গুরু পরিশ্রমে নষ্ট-স্বাস্থ্য বৃদ্ধ তাহা বহু চেষ্টাতেও সামলাইতে পারিল না,—অচিরে শয্যা আশ্রয় করিল।

ঔষধ-পথ্য ও চিকিৎসা প্রভৃতিতে ক্ষ্যান্তমণি তাহার সমস্ত পুঁজিপাটা ব্যয় করিয়া, এমন কি ঋণের ভার আরও বৃদ্ধি করিয়াও

মর্ম্মাহত স্বামীকে বাঁচাইতে পারিল না। রাধানাথ শেষ সময়ে দীনুকে একবার দেখিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ক্ষ্যান্তমণি দেবরকে ডাকিয়া আনিবার জন্য জ্যেষ্ঠপুত্র মাণিকলালকে পাঠাইয়া দিল। মাণিকলাল কিন্তু খুড়িমার নিকট লাঞ্ছিত হইয়া একা কাঁদিতে-কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল। ক্ষ্যান্তমণি অশ্রু মুছিয়া স্বামীকে জানাইল, "ঠাকুরপো গ্রামে নাই, জমীদারী কাজে মফস্বলে গিয়াছে—ফিরিতে বিলম্ব হইবে।" যাহা হউক, রাধানাথকে আর সে অনির্দ্দিষ্ট বিলম্ব পর্য্যন্ত বুঝিতে হইল না। তাহার মুমূর্ষু প্রাণ শেষ পর্য্যন্ত ভাইয়ের প্রতীক্ষায় থাকিয়া-থাকিয়া শেষে হাহাকার করিয়া মরিল।

মাণিক তখন আট বৎসরের বালকমাত্র এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মতি পাঁচ বৎসরের শিশু।

সদ্য-পিতৃহীন বালকদ্বয়ের অশৌচান্ত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের সর্ব্বস্বান্তও হইয়া গেল। কেবলমাত্র শ্রীমন্ত সর্দ্দারের চেষ্টায় তাহাদের কুঁড়েটুকু রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু আর সমস্তই ঋণের দায়ে নিলামে বিক্রয় হইয়া গেল। কাণাঘুষা চলিতে-চলিতে ক্রমশঃ গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, দীনু মাইতি তাহার অধিকাংশই বেনামীতে খরিদ করিয়াছে। নিরুপায় মাণ্‌কের মা তখন গ্রামের অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ী-বাড়ী ধান ভাণিয়া, চাল ঝাড়িয়া এবং অবসরমত সূতা কাটিয়া অতি কষ্টে নাবালক ছেলে দু'টিকে মানুষ করিতে লাগিল। এই উপায়ে অনাথা সামান্য যাহা

অর্জ্জন করিত, তাহাতে তিনটী প্রাণীর দুইবেলা পেট ভরিয়া আহারের সঙ্কুলান হইত না। কাজেই ক্ষ্যান্তমণিকে মাসের মধ্যে দুইটা একাদশী ছাড়া অতিরিক্ত আরও অনেকগুলা একাদশী করিতে হইত।

৺ ইচ্ছায় অল্পদিনের মধ্যেই মাণ্‌কের মার উপবাসের দিনগুলা সংক্ষেপ হইয়া আসিল। শ্রীমন্ত সর্দ্দারের সুপারিশে মাণিকের জমীদার-বাটীতে একটী চাকৃরী জুটিল। কিন্তু নিতান্ত ছোকৃরা বলিয়া উদার জমীদার মহাশয় তাহাকে বেতন দিতে সম্মত হইলেন না। কেবলমাত্র পেটভাতের বন্দোবস্তে তাহাকে আপনার পাথাটানা কাজে নিযুক্ত করিলেন।

রাধানাথের প্রাণান্ত যত্নে দীনু বাংলা লেখাপড়া বেশ ভাল রকমই শিখিয়াছিল, এবং দাদারই চেষ্টায় সে জমীদারী-সেরেস্তায় আমলার পদ পাইয়াছিল। সেইখানেই আজ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই ভৃত্যজনোচিত নীচ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া দীনুর যেন মাথা কাটা গেল। এই ব্যাপারটা তার পক্ষে এতই মানহানিকর বলিয়া বোধ হইল, যে, সেই দিনই অপরাহ্নে কাছারীর ফেরত— যে দীনু পৃথক্ হইবার পরদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দুই বৎসরের উপর হইল এযাবৎ একবারও সেদিক মাড়ায় নাই, এমন কি দাদার রোগে, মৃত্যুকালে, অশৌচান্তেও উঁকিটি মারে নাই—সে আজ তার নিজের মানের দায়ে একেবারে সরাসর সেই পরিত্যক্ত কুটীর-প্রাঙ্গণে হাজির হইয়া ডাক দিল, "বৌঠাকরুণ!"

প্রাঙ্গণের সম্মুখস্থ দাওয়ার উপর বসিয়া ক্ষ্যান্তমণি তখন তাহার একখানি শতছিন্ন বস্ত্রের সযত্নে সংস্কার করিতেছিল। স্বামীর পরম স্নেহাস্পদের এই চিরপরিচিত অথচ বহুদিনের অশ্রুত ও অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর সহসা আজ তাহারই অঙ্গনের মধ্যে ধ্বনিত হইবামাত্র মাণিকের মার কম্পিত হস্তে সেলাইয়ের ছুঁচটা সজোরে বিঁধিয়া গেল। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই—রুগ্ন-শয্যায় স্বামীর সেই আশার বাণী নিত্যই তাহার মনে পড়ে "দীনু কি আমাদের পর রে!" ছুঁচ, সূতা ও কাপড় রাখিয়া ক্ষ্যান্তমণি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল; এবং ঘরের ভিতর হইতে একখানি পিঁড়ি আনিয়া দাওয়ার উপর পাতিয়া দিল। কাছারীর ফেরত আসিয়াছে দেখিয়া হাত-মুখ ধুইবার জন্য সত্বর এক ঘটি জল আনিয়া উপস্থিত করিল; এবং দীনু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই পিঁড়ির সম্মুখে একটী ছোট্ট ধামী করিয়া চারটী মুড়ি, একটু গুড় ও পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল আনিয়া রাখিল। দীনু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "থাক্! থাক্! বৌঠাকরুণ! ওসব কেন? আমি এখনি যাব, একটা বিশেষ কাজে এসেছি, বেশীক্ষণ ত বস্‌তে পার্ব্ব না।" মাণ্‌কের মা ততক্ষণে পানের সজ্জা বাহির করিয়া পান সাজিতে সুরু করিয়াছে; মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে কি হয় ঠাকুরপো! আজ কদ্দিন পরে যদি দয়া করে এসেছ, একটু বসে যেতে হবে বই কি! বাড়ীর সব খপর কি বল? ছোট-বৌ কেমন আছে? নারাণ কেমন আছে? পুঁটীকে অনেকদিন দেখিনি, সে কত

বড়টি হ'ল?" ইত্যাদি প্রশ্ন-জালে দীনুকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

পিঁড়ির উপর বসিয়া দীনু বলিল, "তোমার আশীর্ব্বাদে খবর আর সবই ভালো, কেবল এই ক'দিন বৃষ্টি-বাদলায় ছোট-বৌয়ের হাঁপানী কাশীটা একটু বেড়েছে।" এইরূপ সংক্ষেপে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সারিয়া দীনু মাইতি অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল, তাই ত এ কি ব্যাপার! কোথায় সে মনে করিয়াছিল বৌঠাকরুণ না জানি তাহাকে কত তিরস্কারই করিবে, হয় ত বা অপমান করিতেও ছাড়িবে না! এই ভয়েই ত এতদিন সে এখানে মুখ দেখাইতে পারে নাই! কিন্তু এ কি?—এ কি অকৃত্রিম সাদর অভ্যর্থনা! বৌঠাকরুণ যে মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা না করিয়া সহাস্যে, প্রফুল্ল মুখে নির্ব্বিকার চিত্তে তাহার সেই স্বেচ্ছায় পরিত্যক্ত স্নেহাঞ্চলখানি সাগ্রহে বিছাইয়া দিবে, এ ত দীনু স্বপ্নেও আশা করিতে পারে নাই!

দাওয়ার এক পাশে একখানি জীর্ণ, মলিন মাদুরের উপর কোমরে একটী ঘুন্‌সী-বাঁধা দিগম্বর মতিলাল তখনও ঘুমাইতেছিল। ক্ষ্যান্তমণি তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল, "মতি! ওঠ্ ওঠ্—চেয়ে দেখ্ কে এসেছে?" মতি তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ রগড়াইতে-রগড়াইতে, নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যা মা! বাবা ফিরে এসেছে বুঝি?" পরিহিত বসন-প্রান্তে পুত্রের ললাট ও গ্রীবাদেশ হইতে সযত্নে স্বেদবিন্দু মুছাইয়া দিয়া মা বলিলেন, "দূর

বোকা ছেলে! চেয়ে দেখ্ না কে এসেছে—যা, পেন্নাম করে পায়ের ধূলো নিয়ে আয়।" মতি এবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া—যেন চিনিতে পারিল। অমনি ছুটিয়া কাকার কোলের উপর গিয়া বসিল। ক্ষ্যান্তমণি জিজ্ঞাসা করিল, "কে বল্ দেখি, মতি?" মতি কাকার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি বুঝি জানিনি,—এ ত আমার কাকা!" তার পর দুষ্ট মতি তাহার কাকার কোল হইতে কাঁধের উপর উঠিয়া বসিল; এবং দুই হাতে কাকার চিবুক ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"কাকা, তুমি এসেছ? বাবাও আসবে। তুমি কোথায় চলে গেছলে? তুমি চলে গেলে, বাবা চলে গেল, সব্বাই চলে গেল—আর আমি ঘোঁড়া-ঘোঁড়া খেলতে পাইনি। মা ভাল ঘোঁড়া হতে পারে না—কাকা, আর তোমাকে পালাতে দিচ্ছিনি কিন্তু;—লক্ষ্মীটী কাকা, আর আমি তোমাকে চাবুক মার্ব্বোনা কেমন?"—দীনুর চক্ষের পাতা অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। মতিকে কাঁধ হইতে বুকে টানিয়া লইয়া, তাহার গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইতে-বুলাইতে দীনু বলিল, "ছেলেগুলো বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছে বৌঠান!" ক্ষ্যান্তমণি উদাস-ভাবে বলিল, "কি কর্ব্ব ভাই, সমস্ত দিন যে দুষ্টুপনা করে,—মাথার উপর শাসন কর্ব্বার ত আর কেউ নেই। তবু তুমি মাণ্‌কেটাকে এখনও দেখনি ঠাকুরপো! সেটার একেবারে অস্থি-চর্ম্ম-সার হয়েছে। তাকে দেখ্‌লে তুমি হয় ত আমাকে ঝাঁটা-পেটা কর্ব্বে!"

মাণ্‌কের বিষয় বলিবার জন্যই দীনু মাইতি আজ এখানে আসিয়াছিল ; কিন্তু স্নেহের অত্যাচারে এতক্ষণ তাহা ভুলিয়াছিল। হঠাৎ মাণ্‌কের নাম শুনিয়াই তাহা মনে পড়িয়া গেল। দীনু সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ, ভাল কথা বৌঠান, মাণ্‌কেকে তুমি ও কাজে দিয়েছ কেন? ওখানে ত ওকে রাখা হবে না।" ক্ষ্যান্তমণি বেশ সহজ ভাবেই বলিল, "বেশ ত, তুমি যা ভাল বোঝ, কর না,—এ সব তো তোমারই দেখ্‌বার কথা,—আমি মেয়েমানুষ, আমি কি ভাই অত-শত বুঝি?" দীনু এক গাল মুড়ী মুখে পূরিয়া চিবাইতে-চিবাইতে বলিল, "না—তা, বৌঠান ; দেখ, আর কোন আপত্তি ছিল না আমার—তবে কি জান—কাজটা বড় খাটো কাজ—" ক্ষ্যান্তমণি এবার একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিল—"বলি হ্যাঁগা ঠাকুরপো—সে ছোঁড়ার কি এই কাজ কর্ব্বার বয়স? এমন বয়সে যে তোম্‌রা ছিলে পাঠশালায় পোড়ো!—" দীনু একটু অপ্রতিভ হইয়া সমস্ত গুড়টুকু মুখের ভিতর পূরিয়া বলিল—"আমিও তাই বল্‌তে যাচ্ছিলেম, বৌঠান,—ওকে আবার পাঠশালাতেই দাও। আর দিনকতক পড়াশুনা করুক,—ক্রমে শুভঙ্করীটা দোরস্ত হয়ে গেলে, চাই কি এর পর সেরেস্তায় একটা কর্ম্ম-কাজ কিছু জুটে যেতে পারে, বুঝ্‌লে?" ক্ষ্যান্তমণি যদিও হাসিতে-হাসিতে বলিল, "সবই বুঝি ঠাকুরপো,—কিন্তু কথা হচ্ছে কি জান, জমীদার-বাড়ী ও দু'বেলা দু'মুটো খেয়ে বাঁচ্‌ছে—পাঠশালে দিলে যে ওকে না খেয়ে পড়তে যেতে হবে!

খালি পেটে কি শুভঙ্করীটা ভাল দোরস্ত করতে পার্ব্বে—বাপকে হারিয়ে তুমি যেমন গোবর-গণেশ দাদা পেয়েছিলে, ওর তো ভাই তেমন দাদা কেউ নেই!"—কিন্তু দীনুর পিঠে এই কথা গুলোই যেন সজোরে চাবুক মারিল,—শৈশবের সমস্ত ইতিহাসটা এক নিমেষে যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে চিত্রের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। অপরাধীর মত নতমুখে সে বলিতে লাগিল, "আমায় মাপ কর, বৌঠান, আমি তোমাদের সঙ্গে বড়ই অধর্ম্ম করেছি! মাণিককে বোলো, কাল থেকে দু'বেলা আমার ওখানে খেয়ে পড়তে যাবে। আর গুরুমশাইকে আমি বলে দেবো এখন,—ওর পাঠাশালার খরচ আমার কাছে চেয়ে নেবে।" মাণিকের মা শুধু বলিল, "বেশ, কাল থেকে তার সেই ব্যবস্থাই হবে; তবে তুমি নিজে কাল সকালে একবার এসে ছোঁড়াটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও;—নইলে হয় ত হতভাগা যেতে চাইবে না।" "আচ্ছা, তাই আস্‌বো" বলিয়া দীনু উঠিয়া পড়িল। ক্ষ্যান্তমণি তাহাকে উঠিয়া পড়িতে দেখিয়া বলিল, "ও কি, এর মধ্যেই উঠে পড়লে যে ঠাকুরপো! ওই কটা মুড়ি, তাও যে সব পড়ে রইল—না—না, তা হবে না,—ও ক'টা দানা গালে ফেলে দাও—" দীনু হাত জোড় করিয়া বলিল, "দোহাই বৌঠান, আর পার্ব্ব না,—জমীদার বাড়ী আজ অনেকগুলো আম খেয়েছি—পেটটা বোঝাই হয়ে রয়েছে—" আমের কথা শুনিয়াই মতি গিয়া কাকার হাত ধরিয়া আব্দার করিল, "আমি আঁব খাব কাকা!—আমাকে

আঁব এনে দাও,”—দীনু তখন ছাতাটি বগলে করিয়া চটি জুতাটি পায়ে দিয়াছে। কিন্তু মতি ছাড়ে না কিছুতেই,—আম সে এখনি খাইবেই—অগত্যা ক্ষ্যান্তমণি তাহাকে শাসন করিতে উদ্যত হইল। দীনু তখন ট্যাঁক হইতে একটী চকচকে সিকি বাহির করিয়া মতির হাতে দিয়া বলিল, “এই নাও বাবা, কাল হাট বার আছে, আঁব আনিয়ে খেও।” মতি সিকি পাইয়াই চম্পট দিল। ক্ষ্যান্তমণি পুত্রের এই কাঙালের মত আচরণে অপ্রতিভ হইয়া দেবরকে বলিল, “অলবড়েে ছোঁড়াটা যত বড় হচ্ছে, তত ব্যাদড়া হচ্ছে—জমি-জমাগুলো গিয়ে পর্য্যন্ত আঁব-কাঁঠাল ত বড় একটা খেতে পাচ্ছে না কি না—” দীনু আর ইহার কোনও উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে তাহার এই অসীম সহিষ্ণু বৌঠাকরুণের পদপ্রান্তে যথার্থ ভক্তির সহিত মাথাটি আজ এই সর্ব্বপ্রথম অকপট শ্রদ্ধায় অবনত করিয়া গৃহে ফিরিল। প্রাঙ্গণ পার হইতে-হইতে শুনিতে লাগিল স্নেহময়ীর সুমধুর আশীর্ব্বাদ—“বেঁচে থাক—সুখে থাক ভাই, রাজা হও,—অখণ্ড প্রমাই হ’ক—”

রাত্রিতে আহারাদির পর দীনু তক্তপোষের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছে,—দীনুর স্ত্রী মাতঙ্গিনী মেঝেয় বসিয়া বুকে-পিঠে গরম তেল মালিশ করিতেছে। দীনু বার-কয়েক তার ডাবা হুঁকাটায় সজোরে টান মারিয়া, নাক-মুখ দিয়া অনেকটা ধোঁয়া বাহির করিয়া, কাশিতে কাশিতে বলিল, “শুনেছিস্ বৌ, মাণ্কেটা

জমীদার-বাড়ী পাখাটানা কাজে ঢুকেছে? ছি—ছি, লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেছে! আমি হলুম সেরেস্তার একটা বড় চাকরে—একটা মান্যগণ্য আম্‌লা,—আর আমারই ভাইপো সেখানে একটা পাখাটানা বেয়ারা হয়ে রইল! তাও আবার মিনি-মাইনের পেট-ভাতে!—কতদূর অপমানের কথাটা বল্ দিকি!" মাতঙ্গিনী হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিল, "ওমা কি ঘেন্না! বড়কীর আক্কেলকে বলিহারী যাই! হারামজাদা মাগী তোমার মুখ হেঁট করাতেই বজ্জাতি করে ওখানে ছেলে পাঠিয়েছে বোধ হয়! গতরখাগীর বেটার পেটে-পেটে শয়তানী বুদ্ধি।" দীনু একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "দূর! তা কেন! বৌঠানের আমি তত দোষ দিইনি—ছোঁড়াটাকে নিয়ে গেছে ঐ শালা শ্রীমন্ত সর্দ্দার!"

"বটে!—জমীদারের সর্দ্দার পেয়াদা হয়ে ব্যাটা ধরাকে সরা দেখেছে বুঝি! ড্যাক্‌রার আস্পর্দ্ধা ত কম নয়! ব্যাটা মরতো এতদিন জেলে পচে,—ওই বড়কীর বাপ শক্ররাই ত বাদ সাধলে।" বলিতে-বলিতে মাতঙ্গিনীর হাঁপ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। দীনু বলিল, "সেই জন্যই ত ব্যাটা আজও ওদের গোলাম হয়ে আছে।" মাতঙ্গিনী মুখখানা তোলো হাঁড়ীর মত করিয়া বলিল, "এখন উপায়! শত্তুরেরা যে তোমার মুখ দেখান দায় করে তুল্‌লে!" দীনু এবার তামাকের সমস্ত ধোঁয়াটুকু হুঁকার খোল হইতে যেন নিঃশেষে টানিয়া লইয়া সগর্ব্বে বলিল, "সে উপায় কি না করেই বাড়ী ঢুকিছি রে? শাস্ত্রে আছে 'যাক্ প্রাণ, থাক্ মান।' আজ

কাছারীর ফেরত সটান ওবাড়ী গিয়ে হাজির হয়েছিলুম। বড় বৌকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে ছোঁড়াটাকে চাক্‌রী ছাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করে এসেছি।" এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই মাতঙ্গিনীর মুখখানা বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং হাঁপানীর টানও একটু কম পড়িয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই দীনু যেই বলিল—"কাল থেকে মাণ্‌কে দু'বেলা আমার এখানে খেয়ে ওই বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতের পাঠশালে শটুকে পড়তে যাবে"—মাতঙ্গিনীর মুখ আবার অন্ধকার হইয়া উঠিল—এবং সঙ্গে-সঙ্গে হাঁপানির যতটুকু টান কম পড়িয়াছিল, তাহা আবার সুদে-আসলে দ্বিগুণ বেগে আত্মপ্রকাশ করিল। তথাপি চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীটি গণ্ডদেশে স্থাপন করিয়া মাতঙ্গিনী সশব্দে বলিয়া উঠিল, "ও সর্ব্বনাশ!—করেছ কি? তোমার কি আক্কেল-বুদ্ধি একরত্তি নেই? বাবু এ কথা শুন্‌লে যে এখনি তোমায় জবাব দেবেন! তাঁর মিনি-মাইনের পাখাটানা বেয়ারাটাকে তুমি ভাঙ্গচি দিয়ে নিয়ে এসেছ,—এ কথা তিনি শুন্‌লে কি আর রক্ষে রাখবেন?" এবার দীনুরও চোখ-দুটা কপালে উঠিয়া গেল এবং তাহার পত্নীর সত্যই এতটা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে দেখিয়া, বেচারী বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিল—তাই ত'! এ ত ঠিক বলিয়াছে! তার দুর্দ্দান্ত কৃপণ জমীদার প্রভু ত এ কথা শুনলে রক্ষে রাখ্‌বে না! এটা ত দীনুর মাথায় একবারও আসেনি—! হতাশ ভাবে দীনু তখন হাতের সেই প্রায়-নির্ব্বাপিত ধূম্র-লেশহীন হুঁকাটায় বারকয়েক

নিষ্ফল টান দিয়া, আস্তে-আস্তে সেটাকে ঘরের কোণে নামাইয়া রাখিয়া মাতঙ্গিনীকে বলিল, "তবে উপায়! আমি যে বড় বৌকে বলে এসেছি কাল ভোরে গিয়ে মাণ্‌কেকে নিয়ে আসবো।" মাতঙ্গিনী একটা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "ওঃ! বলে এসেছ ত' একেবারে চোর দায়ে ধরা পড়েছ না কি? না গেলে কি গলাটা কেটে নেবে? এত কিসের তার ধরাধার?—এখন কিছুদিন আর ওদিক মাড়িও না—আর কালই ছোঁড়াটাকে কোন সুযোগে জমীদার-বাড়ী থেকে তাড়াও!" দীনু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমি তাড়াব কি রে? সে কি আমাদের সেরেস্তায় কাজ করে? সে যে একেবারে বাবুর খাসে ঢুকেছে!" মাতঙ্গিনী তখন মালিশের তেলের ভাঁড়টা তক্তপোষের নিকট ঠেলিয়া রাখিয়া—তৈল-সিক্ত হাতটা মাথার চুলে ঘসিয়া লইয়া, শয্যার উপর উঠিয়া বসিল; এবং কণ্ঠস্বর একটু মৃদু করিয়া একেবারে দীনুর কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "দেখ, এক কাজ করলে হয় না?—দাও না ছোঁড়াটাকে চা-বাগানের কুলি-ডিপোয় চালান দিয়ে!" দীনুর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল! এতখানি জিভ্‌ বাহির করিয়া দীনু বলিল, "ছিঃ! এমন কথা মুখে আনিস্‌ নি! তুই না ছেলের মা?"—মাতঙ্গিনী ইহার কোনও সদুত্তর দিতে পারিল না, —মুখখানা আষাঢ়ের কাল মেঘের মত করিয়া পিছন ফিরিয়া বসিল। দীনু বলিতে লাগিল, "অন্য কোনও একটা সোজা মৎলব ঠাওরা দেখি,—যাতে মনিবও না চটে, চাকরীটাও বজায় থাকে, অথচ

কাজ হাঁসিল হয়! তোর মগজটা খুব সাফ্,—খাসা বুদ্ধি বার করিস্ কিন্তু—” স্বামীর নিকট আত্ম-বুদ্ধির এই অযাচিত উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়া, মাতঙ্গিনী ত্বরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল; এবং তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে সেই মুহূর্ত্তেই আর একটা যে সাধু মতলব আসিয়া ঘন-ঘন ত্রিশূল ঠুকিতেছিল, তাহাই ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। সেটা হইতেছে এই যে, কোন প্রকারে মাণিককে চোর প্রতিপন্ন করিয়া জমীদার-গৃহ হইতে বিতাড়িত করা। দীনু অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, এ কার্য্যটা অপেক্ষাকৃত সহজ সাব্যস্ত করিয়া, এই উপায়ই অবলম্বন করিবে স্থির করিল।

৩

পরদিন সকালে দীনু মাণিককে লইতে আসিল না দেখিয়া ক্ষ্যান্তমণি চিন্তিত হইয়া উঠিল। তবে কি দীনুর অসুখ-বিসুখ করিল না কি? না রাতারাতি আবার মতলব ফিরিয়া গিয়াছে? অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল, শেষোক্ত ব্যাপারটাই হওয়া সম্ভব। নিশ্চয়ই ছোট বৌয়ের পরামর্শে ঠাকুরপোর মতি-গতি আবার বদল হইয়াছে। এমন সময় শ্রীমন্ত সর্দ্দার আসিয়া হাঁকিল, “দিদিঠাকরুণ! মাণ্‌কে, মতি কোথা গো? তাদের জন্য আম এনেছি যে!” বলিতে-বলিতে সে গামছা খুলিয়া প্রায় ২।৩ কুড়ি ছোট-বড় আম্র দাওয়ার উপর ঢালিয়া দিল।

মতি তখন হেঁসেল-ঘরে ঢুকিয়া চুপি-চুপি তেল চুরি করিয়া মাখিতেছিল। আমের নাম শুনিয়াই সে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা ভুলিয়া গেল; এবং মাথায় এক-খাম্‌চা ও পেটে এক-খাম্‌চা তেল শুদ্ধ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। তার পর কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, দুই হাতে দুইটি আম তুলিয়া লইয়া, চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল। মাণিক তখন তাহার পুরাতন শিশুবোধ ও জীর্ণ ধারাপাতখানি ঝাড়িয়া-মুছিয়া, দপ্তর বাঁধিয়া, মাটীর দোয়াতের শুক্‌নো কালিটুকু জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিয়া, ফ্রেমহীন কোণ-ভাঙ্গা ছোট শ্লেটখানি অতি যত্নের সহিত কাঠ-কয়লার সাহায্যে ঘসিয়া-মাজিয়া পরিষ্কার করিতেছিল। শ্রীমন্তর গলা পাইয়া সে শ্লেট হাতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "শ্রীমন্ত-দা! আজ আর আমি জমীদার-বাড়ী যাব না,—কাকা এসে আমায় পাঠশালে নে যাবে বলেছে।" শ্রীমন্তর চক্ষে বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল। সে মাণিকের মার দিকে চাহিতেই ক্ষ্যান্তমণি বলিল,—"শ্রীমন্ত-দা! তুমি এসে পড়েছ, ভালই হয়েছে। ছোঁড়াটাকে জমীদার-বাড়ী টেনে নিয়ে যাও, আর এই সিকিটা ঠাকুরপোর হাতে ফিরিয়ে দিও।" বলিয়া আঁচল হইতে সিকিটি খুলিয়া শ্রীমন্তর হাতে দিল; এবং সিকিটির সম্পূর্ণ ইতিহাস ও তৎপ্রসঙ্গে দীনুর আকস্মিক আবির্ভাব হইতে মাণিকের সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থার প্রস্তাব পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই তাহাকে জানাইয়া অধীর ভাবে বলিয়া উঠিল, "ও সমস্তই বাজে কথা শ্রীমন্ত-দা! নইলে দেখ না কেন,—এতখানি

বেলা হ'ল তবুও ত কই নিতে এল না! আচ্ছা, ৺ না করুন, ঠাকুরপোর হঠাৎ কোন অসুখ-বিসুখ হয় নি ত?" শ্রীমন্ত মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "হেঁ গো দিদিঠাকুরুণ, রাখ না ও কথা তুলে —বলি অসুখ কার বটে গো? সে ভেড়ের-ভেড়েরে যে এখনি হাটে দেখে এলুম গো! সে নিমখারামের একটা কথাও বিশ্বাস্ যেও না দিদিমণি—তা' তোমায় বলে দিচ্ছি। এ বাড়ীর হালচাল কি জানতে, এ নিশ্চয় সেই ভাললোকের মেয়ে তেনাকে পাঠিয়ে-ছ্যালো! কিছু কুমতলবে আছে মনে হয়। যাহ হ'ক, আমি এর একটা বোঝা-পড়া করে লেব'খন।" বলিয়া শ্রীমন্ত সর্দার সিকিটা ট্যাঁকে গুঁজিয়া মাণিককে লইয়া জমীদার-বাড়ী চলিয়া গেল। সেই অবধি কি জানি কেন মাণ্‌কের মার প্রাণটা কেমন উতলা হইয়া রহিল।

অপরাহ্ণে নিদ্রা-ভঙ্গের পর জমীদার-বাবু গাত্রোত্থান করিয়া, সময় দেখিবার জন্য বালিশের নীচে যখন তাঁর সোণার ট্যাঁক-ঘড়িটি খুঁজিয়া পাইলেন না, তখন বিস্মিত ভাবে একবার শয্যার এ-কোণ, একবার ও-কোণ চার-কোণ অনুসন্ধান করিয়া, পার্শ্বস্থ টুলের উপর উপবিষ্ট মাণিকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—ছোক্‌রার তন্দ্রাভিভূত শিথিল হস্ত হইতে ঝালর-দেওয়া রংচংএ পাখাখানি খসিয়া, মাটিতে পড়িয়া লুটাইতেছে; আর ছোক্‌রার ছোট মাথাটি ঘুমে ঢলিয়া অসম্ভব রকম সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রচণ্ড ক্রোধে জমীদার-বাবু তখন একটা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন।

শীঘ্রই জমীদার-বাবুর বিস্তৃত অট্টালিকার সদর ও অন্দর মহলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কে-কে সে-দিন মধ্যাহ্নে বাবুর ঘরে আসিয়াছিল, তদারক করিয়া জানা গেল যে, দীনু মুহুরী ব্যতীত আর কেহই সে-দিন বাবুর কাছে আসে নাই। দীনু মুহুরী হলপ করিয়া বলিল, সে একখানি জরুরী চিঠি সহি করাইবার জন্য বাবুর কাছে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু ঘরের ভিতর প্রবেশ করে নাই; দুয়ার হইতেই বাবুকে নিদ্রিত দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, তবে মাণিককে সেই সময়ে বাবুর মাথার বালিশের নিকট হইতে যেন হঠাৎ চোরের মত সরিয়া আসিতে দেখিয়াছিল। ইত্যাদি। কিন্তু মাণিক বলে, সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঘড়ির বিষয় কিছুই জানে না। তথাপি মাণিককে একবার উলঙ্গ করিয়া তাহার কাপড় ঝাড়া লওয়া হইল; এবং এ উপায়েও যখন ঘড়ির একটা কাঁটাও তাহার নিকট পাওয়া গেল না, তখন প্রশ্ন উঠিল যে, মাণিক একবারও ঘরের বাহির হইয়াছিল কি না? অনেকেই সাক্ষ্য দিল যে, হাঁ৷ তাহারা একবার মাণিককে বাহিরে আসিতে দেখিয়াছে বটে। মাণিকও তাহা অস্বীকার করিল না,—সে যে প্রস্রাব করিতে একবার বাহিরে আসিয়াছিল, তাহা নির্ভয়ে কবুল করিল; এবং ইহাও বলিল যে, জমীদার-বাবু তখনও জাগিয়া ছিলেন,—তিনি চোখ বুজিয়া ফরসীর নলের মুখ হইতে ধোঁয়া টানিয়া ছাড়িতেছিলেন; এবং তাঁহার আল্‌বোলাও তখনও পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট ডাকিতেছিল। কিন্তু বিচারক ও তদন্তকারিগণ কেহই

আল্‌বোলা ও ফরসীর নলের সাফাই সাক্ষ্য গ্রহণ করিল না। তাহাদের চক্ষে মাণিকের দোষ সপ্রমাণ হইয়া গেল; এবং আর অধিক কিছু অনুসন্ধানেরও কিছুমাত্র আবশ্যকতা রহিল না। তখন সকলে মিলিয়া, মাণিক ঘড়িটী চুরি করিয়া যথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, তথা হইতে শীঘ্র উহা বাহির করিয়া দিবার জন্য, বালকের উপর মহা পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। মাণিক কিছুই জানে না—ইহা অসংখ্য বার বলিয়াও যখন রেহাই পাইল না, তখন ভীত হইয়া উঠিল, এবং তাহার চোখদুটি ছল-ছল করিতে লাগিল। তখন বাবুজীর আর ধৈর্য্য রহিল না। তিনি হুকুম দিলেন,—"মারের চোটে ছোঁড়ার কাছ থেকে ঘড়ি আদায় কর।" তিন-চারজন প্রভুভক্ত তৎক্ষণাৎ মনিবের আদেশ প্রতিপালনে তৎপর হইল। মাণিক এবার পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন শ্রীমন্ত-সর্দ্দার বাঘের মত লাফাইয়া পড়িয়া, মাণিককে অত্যাচারীর হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইল; গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"খবর্দ্দার কচি ছেলের গায়ে হাত তুলো না।" তার পর জমীদার-বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"হুজুর! এ দুধের বাচ্ছাটাকে আর মার-ধোর কর্ব্বেন না। আপনারা রাজা-উজীর মানুষ, একটা ফড়িং মেরে আর হাত গঁদাবেন কেন—তার চেয়ে একে জবাব দিন।" দীনু মুহুরী তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"সেই ভাল বাবু, ছোঁড়াটাকে বাড়ী থেকে বার করে দিন।" জমীদার মহাশয় হুঙ্কার দিয়া বলিয়া

উঠিলেন, "চোপরাও! আমি কারু কথা শুনতে চাই নি,—আমি ঘড়ি চাই। সহজে না দেয়, আমি ও বিচ্ছু ছোঁড়াকে পুলিশে দোবো!" শ্রীমন্ত-সর্দ্দার যেন কতকটা তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল, —"এখুনি দিন হুজুর, সে ত ভাল কথা। তবে তারা এসে ত শুধু এ বাচ্ছাকে নে যাবে না—আপনার ওই দীনু মুহুরীটারও হাতে হাতকড়ি পরাবে!" দীনুর মুখখানা তখন তার অন্তরের বিভীষিকায় পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে,—কণ্ঠতালু শুষ্ক, নীরস বক্ষের ভিতর রক্তের তাল যেন প্রচণ্ড তুফানে অতি দ্রুত ওঠা-নামা করিতেছে।

শ্রীমন্তের এতদূর স্পর্দ্ধা জমীদার মহাশয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুই এখনি আমার জমীদারী থেকে দূর হয়ে যা! তোকে আর ঐ ছোঁড়াটাকে—তোদের দু'জনকেই আমি আজ থেকে বরখাস্ত করলুম।" শ্রীমন্ত "যে আজ্ঞে" বলিয়া তাহার গোটা বৎসরের বাকী মাহিনা-পত্র হিসাব করিয়া চুকাইয়া দিতে বলিল। জমীদার-প্রভু হুঙ্কার দিয়া বলিলেন,—"এক পয়সাও পাবিনে; তুই ঐ ছোঁড়ার জামিন হয়েছিলি, তাই ত ওকে আমি রেখেছিলুম। তোর সমস্ত পাওনা টাকাকড়ি দপ্তরে বাজেয়াপ্ত হ'য়ে গেল। যা, অমনি শুধু হাতে দূর হয়ে যা।" শ্রীমন্ত আর একটী কথাও কহিল না,—নিঃশব্দে মনিবকে একটী দণ্ডবৎ করিয়া মাণিকের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল।

পথে যাইতে-যাইতে মাণিক বলিল, "শ্রীমন্ত-দা আমি ত ঘড়ি নিই নি।" শ্রীমন্ত সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল, "সে আমি জানি ভাই, তোমায় কিছু বলতে হবে না।" মাণিক বলিল, "তবে কেন তুমি তোমার মাইনের টাকা-কড়ি ওদের দিয়ে এলে?" শ্রীমন্ত এবার ঠিক সমবয়স্ক বন্ধুর মত মাণিকের কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া বলিল, "ওসব ছোটলোকদের পয়সা কি ছুঁতে আছে মাণ্‌কে? ও হ'ল গরীব-দুঃখীর রক্ত-শোষা কড়ি—নিলে মহাপাতক হয়!" মাণিক এ কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না; সুতরাং চুপ করিয়া রহিল।

যেদিন ভোরের ট্রেণে শ্রীমন্ত মাণিককে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইল, সেদিন যাবার সময় চোখের জল মুছিতে-মুছিতে ক্ষ্যান্তমণি মাণিকের কোঁচার খুঁটে দশটা পয়সা বাঁধিয়া দিল; এবং শ্রীমন্তর হাতে মাণিককে কলিকাতায় লইয়া যাইবার গাড়ী-ভাড়া হিসাবে বার আনা পয়সা দিতে গেল। শ্রীমন্ত বলিল, "আমার কাছে ত টাকা-পয়সা রয়েছে দিদিঠাক্‌রুণ!" ক্ষ্যান্তমণি বলিল, "তা হ'ক, বিদেশে-বিভূঁয়ে যাচ্ছ, সঙ্গে কিছু বেশী থাকাই ভাল।" শ্রীমন্ত কিন্তু কিছুতেই লইতে চাহে না। তখন ক্ষ্যান্তমণি তাহাকে মাথার দিব্য দিয়া গছাইয়া দিল। শ্রীমন্ত এবার আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না বটে, কিন্তু যদি সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিত যে, কি করিয়া এই কপর্দ্দকশূন্য অনাথা বিধবা আজ এই ৸৶১০ সাড়ে চৌদ্দ আনা পয়সা সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা

হইলে সহস্র মাথার দিব্য দেওয়া সত্ত্বেও কিছুতেই সে উহা হাতে করিতে পারিত না। রুগ্ন স্বামীর চিকিৎসার জন্য ক্ষ্যান্তমণি একে-একে সংসারের সমস্ত তৈজসপত্রই বিক্রয় করিয়াছিল; কেবল রাধানাথ সারিয়া উঠিলে পথ্য করিবে বলিয়া একখানিমাত্র কাঁসার থালা অতি কষ্টে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। পুত্রের বিদেশ-গমন উপলক্ষে তাহাই আজ সকালে কাঁসারীদের নিকট বন্ধক রাখিয়া সে এই ৷৶১০ সাড়ে চৌদ্দ আনা পয়সা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।

মাণিক যখন তাহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া, তাহার দুই পায়ের ধূলা লইয়া গায়ে-মাথায় বুলাইয়া, শ্রীমন্তর সঙ্গে হাসিমুখে চলিয়া গেল, তখন দুয়ারে দাঁড়াইয়া তাহাদের দেখিতে-দেখিতে, ক্ষ্যান্তমণির দু'চোখ দিয়া যেন অফুরন্ত অশ্রুজল নিঃশব্দে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মতি• এতক্ষণ মায়ের অঞ্চল ধরিয়া বায়না করিতেছিল, "ওমা! আমিও কলকাতা যাব,—আমাকেও পয়সা দে না—" কিন্তু হঠাৎ মায়ের চক্ষে সেই অবিরল জলধারা দেখিয়া, সে বালকও তৎক্ষণাৎ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

৪

মস্ত একটা কাঠের সিন্দুকের মধ্যে শালুমোড়া কড়িবাঁধা একটা ডাগর সিঁদূর চুপড়ির ভিতর সোণার ঘড়ি, ঘড়ির চেনটা লুকাইয়া রাখিতে-রাখিতে সহাস্য বদনে মাতঙ্গিনী বলিল, "দেখ্‌লে ত—আমার বুদ্ধি শুনে চল্‌লে সব দিকে ভাল হয়! কেমন নিখরচায় একটা সোণার ঘড়ি-ঘড়ির-চেন হ'ল—ওদিকে শত্রুও বিদেয় হ'ল! একঢিলে দু'পাখী ম'ল। শ্রীমন্ত মুখপোড়ার যে অন্ন উঠেছে, এতে আমি খুব খুসী! এতদিনে মা-কালী আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। ড্যাক্‌রা মিন্সে বড় বাড় বাড়িয়েছিল,—তেম্‌নি হ'ল; হাতে-হাতে তার শাস্তি ফলেছে। আর হবে নাই বা কেন? মাথার ওপর এখনও ভগবান রয়েছেন,—আজও সাঁঝ-সকালে চন্দ্র-সূর্য্যি উদয় হচ্ছেন; পাপের ফল ফল্‌বে না?" বলিতে-বলিতে সিন্দুকের ডালা বন্ধ করিয়া, শিকল আঁটিয়া, ডবল তালা-চাবি লাগাইয়া, আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছা মাতঙ্গিনী বেশ প্রফুল্ল চিত্তে কাঁধের উপর ঝনাৎ করিয়া পিঠের দিকে ঝুলাইয়া দিল। এই সময়ে বেশ জোরে আর এক পশলা বৃষ্টি নামিল। মাতঙ্গিনী তাহার ছোট ঘরের ছোট-ছোট জানালা-দুটী বন্ধ করিয়া দিয়া, নিশ্চিন্ত প্রসন্ন গতিতে আজিকার সুসিদ্ধ কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহার আজ্ঞাবাহী মানুষটীর চিবুক ধরিয়া একটু সোহাগ করিবার জন্য কাছে আসিয়া, সহসা উদ্যত হাতখানি

নামাইয়া লইল। দীনু তখন দুই হাতে তাহার মাথার দুইটা রগ টিপিয়া ধরিয়া, চোখ বুজিয়া বসিয়াছিল। তাহার সমস্ত মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে,—সর্ব্বশরীর ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছে! মাতঙ্গিনী ব্যগ্র উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, অমন করে রয়েছ কেন? কি হয়েছে? এত কাঁপুনি ধরেছে কিসের? অসুখ-বিসুখ কিছু করেনি ত?"

দীনু কাঁপিতে-কাঁপিতে অতি কষ্টে বলিল, "শীগ্‌গীর একটা লেপ-কাঁথা কিছু এনে আমায় চাপা দিয়ে বেশ করে টিপে ধর ছোট বৌ,—আমার বড্ড কাঁপুনি ধরেছে—ভয়ানক জ্বর আস্‌ছে!" ঘরের মট্‌কার উপর চালের বাতার সহিত দড়ী দিয়া বাঁধা লেপ-কাঁথা ঝুলিতেছিল;—মাতঙ্গিনী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ছুটিয়া গিয়া উঠান হইতে মইখানা টানিয়া আনিয়া মট্‌কায় লাগাইল; এবং কাঁথা পাড়িতে তাড়াতাড়ি তাহাতে উঠিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায় যখন ডগার নিকট পৌঁছিয়াছে, তখন তাহার অতিমাত্র ব্যস্ততায় বর্ষার জলসিক্ত বাঁশের সিঁড়িটা তাহাকে শুদ্ধ লইয়া সশব্দে শানের মেঝের উপর হড়্‌কাইয়া পড়িল। দীনু হঠাৎ সেই শব্দে চম্‌কাইয়া চাহিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! মই শুদ্ধ মাতঙ্গিনী মেঝের উপর আছাড় খাইয়া সংজ্ঞা হারাইয়াছে। সে প্রবল জ্বরের উপরও মাতালের মত টলিতে-টলিতে উঠিয়া আসিয়া, মাতঙ্গিনীকে তুলিতে গিয়া দেখিল, তাহার মাথায় এক জায়গায় অনেকখানি ফাটিয়া গিয়া ভীষণ রক্ত ছুটিতেছে।

মই-সিঁড়ির সহিত মাতঙ্গিনীর পতনের শব্দে নারায়ণ ও পুঁটির ঘুম ভাঙিয়া গেল। পুঁটি ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। নারায়ণ উঠিয়া খুকীর হাত ধরিয়া বাপের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। দীনু তখন মাতঙ্গিনীর মাথার যেখানটা কাটিয়া গিয়া রক্ত ছুটিতেছিল, সেখানটা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া ছিল। নারায়ণকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "নারাণ উঠিছিস্? শীগ্গীর যা বাবা,—একবার দাদাঠাকুরকে ডেকে নিয়ে আয়। বলিস্, মা পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে গেছে,—আপনি এখনি আসুন, বড় বিপদ!" নারায়ণ তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া বাহির হইতে গিয়া ফিরিয়া আসিল। দীনু তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'লরে, গেলিনে?" নারায়ণ একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, "বাইরে যে বড্ড অন্ধকার বাবা!" বালক অন্ধকারে একা যাইতে ভয় পাইতেছে দেখিয়া দীনু বলিল, "এক কাজ কর;—খুকীকে সঙ্গে করে নিয়ে দু'জনে যা, ভয় নেই। ছুটে যাবি, ছুটে আস্‌বি—দেরী করিস্‌নি যেন।" অগত্যা নারায়ণ পুঁটির হাত ধরিয়া তৎক্ষণাৎ আদুড় গায়েই বাহির হইয়া গেল।

সদ্য-বর্ষণ-ক্ষান্ত আকাশে তখনও নিবিড়, ঘন-কৃষ্ণ মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। আষাঢ়ের ঘন-ঘটায় ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্যুৎ হাসিতেছে। দাদাঠাকুরের আটচালা দীনুর ঘরের খুব নিকটেই,—রায়েদের পুকুরের এপার আর ওপার। নারায়ণ পুঁটির হাত ধরিয়া একপ্রকার ছুটিয়াই যাইতেছিল। মাণিকের অপেক্ষা সে

এক বৎসরের ছোট ; আর পুঁটি প্রায় মতির সমবয়সী। নারায়ণ ও পুঁটি গিয়া যখন দাদাঠাকুরের খিড়কীতে ঘা’ দিল, তখন চড়্‌চড়্‌ করিয়া আবার একপশলা বৃষ্টি নামিল। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর দাদাঠাকুর যখন লণ্ঠন-হাতে, লাঠির ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ করিতে-করিতে টোকা মাথায় দিয়া আসিয়া দরজা খুলিলেন, ছেলেমেয়ে দু’টাই তখন বৃষ্টিতে একেবারে সম্পূর্ণ ভিজিয়া গিয়াছে।

৫

কলিকাতায় মাণিক এক কেরাণীবাবুর বাড়ী মাসিক দেড়-টাকা মাহিনার একটী চাক্‌রী পাইয়াছিল ; আর শ্রীমন্ত সর্দ্দার এক সওদাগরী আফিসের মালগুদামে আট আনা রোজে গাড়ী বোঝাই ও খালাসের কাজে নিযুক্ত হইয়াছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে মাণিকের মনিব কেরাণীবাবুটি একটী ক্ষুদ্র নবাব বিশেষ! তাঁহার ঘড়ি ধরিয়া দুই বেলা চা খাওয়া, ঘন-ঘন তামাক খাওয়া, কাপড় কোঁচান, জামা ঝাড়া, জুতায় কালি লাগান, বৈঠকখানা পরিষ্কার রাখা—এ সমস্তই কাজে ঢুকিবার পরদিনই মাণিকের কাঁধে চাপিয়াছিল। তার পর ক্রমশঃ স্নানের পূর্ব্বে বাবুকে তৈল মর্দ্দন করা, আফিস যাইবার সময় জুতার ফিতা বাঁধিয়া দেওয়া, আফিস হইতে আসিলে জুতা মোজা খুলিয়া

দেওয়া, গা-হাত-পা টিপিয়া দেওয়া ইত্যাদি সহস্র ছোট বড় ফরমাইস খাটাও সুরু হইল। ডাকিবামাত্র মুখে মুখে হাজির হওয়া চাই, হুকুম জাহির হইবামাত্র তামিল হওয়া চাই, কোন দিন ইহার এতটুকু ব্যতিক্রম হইলেই মাণিকের পৃষ্ঠদেশে প্রভুর চটিজুতার চিহ্ন কিছুদিনের মত মুদ্রিত হইয়া থাকিত। এই দেড়-টাকা মাহিনায় ছোক্‌রা চাকরটি পাইবার অগ্রে বাবু নিজেই স্বহস্তে সমস্ত কার্য্য করিতেন; কারণ, তাঁহার বেতন ছিল, সেই কেরাণীকুলের সনাতন ৩০৲ টাকা মাত্র, এবং পৈতৃক সম্বল ছিল একখানি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটী মাত্র। তাঁহার পত্নী সরমাকেও রাঁধুনী ও ঝিয়ের কাজ সমস্তই একা করিতে হইত। পাঁচ বৎসর পরে এবার পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হওয়ায়, তিনি এই ভৃত্যটি নিযুক্ত করিয়া মেজাজটা হঠাৎ খুব উঁচু পর্দ্দায় বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। বাটীতে কেহ আসিলেই, তিনি অকারণ উচ্চৈঃস্বরে মাণিককে আহ্বান করিয়া, একটা যা হ'ক কিছু ফরমাস্ করিতেন; এবং এই উপায়ে, তিনি যে অধুনা দস্তুর-মত একজন ভৃত্যের মনিব, তাহা সবেগে ঘোষণা করিতে ভুলিতেন না।

বাবুর কাছে মার খাইয়া মাণিক যখন কাঁদিতে বসিত, তখন সরমা আসিয়া তাহাকে স্নেহবাক্যে ভুলাইত। পয়সা দিয়া, খাবার দিয়া, সে বালকের বেদনা দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিত। এই উপলক্ষে স্ত্রী-পুরুষে প্রায়ই বচসা হইয়া যাইত। সরমা বলিত, "দেখ, তুমি কথায়-কথায় লোকজনের গায়ে

হাত তুলো না। তোমার না পোষায়; জবাব দিলেই পার,—মার ধোর কর্‌বার কি দরকার?” বাবু বলিতেন, “আলবাৎ মার্ব্ব, বেটার-ছেলে কুঁড়ের সর্দ্দার—বসে-বসে আমার মাইনে খাবে? মার্ব্ব না? না মার্‌লে কি লোকজন টিট্ হয়? তুমি কিছু জান না। কুকুরকে নাই দিলে মাথায় উঠে! অত আদর দিয়ে তুমি আর চাকরটার মাথা খেয়ো না।”

সরমা বলিত, “ওঃ, ভারি চাকর রেখেছেন বাবু! দেড় টাকা মাইনে দিয়ে একটা দুধের ছেলেকে এনে, তার কাছে দশ-টাকা মাইনের একটা মদ্দর মত কাজ নিতে চাও না কি? ওই কচি বাচ্ছা,—ও কি তোমার এত কাজ পারে?” বাবু বলিতেন, “তবে এসেছে কেন মর্ত্তে চাকরী কর্ত্তে? যাক্ না,—ঘরে গিয়ে মায়ের কোলে শুয়ে তুলোয় করে দুধ থাক্ না গিয়ে। এখানে এসে মো’লো কেন?” সরমা বলিয়া উঠিত, “ষাট! ষাট! পরের বাছা দুঃখের ধান্দায় চাক্‌রী কর্‌তে এসেছে,—তাকে অমন কোরে রাত-দিন ‘মর্’ ‘মর্’ বোলো না; ও-সব অকথা-কুকথা মুখে আন্‌তে নেই।” বাবু বলিতেন, “তবে কি চাকরকে দু’বেলা ‘আপনি’ ‘আজ্ঞে’ কর্‌তে হবে না কি? বেটার-ছেলেদের জুতোর তলায় রাখলে তবে সিধে থাক্‌বে।” রাগে সরমার চোখ-মুখ রাঙা হইয়া উঠিত; সে বলিত, “ছিঃ—ছিঃ! ওসব হ’ল লক্ষ্মীছাড়া বৃত্তি,—চাকর-বাকর কি লোকজনের মনে কষ্ট দিলে, লক্ষ্মীশ্রী থাকে না। চাক্‌রী করতে এসেছে বলে কি ওরা মানুষ নয়?

তোমরাও ত আফিসে চাক্‌রী কর। তোমরাও ত সায়েবদের চাকর। তারা যদি রাত-দিন তোমাদের সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করে, তাহ'লে তোমাদের মনের অবস্থাটা কি হয় বল দেখি?” এ কথায় ভয়ানক রাগিয়া উঠিয়া বাবু বলিতেন, “চাকর কি রকম? আমরা সব লেখা-পড়া-জানা ভদ্রলোকের ছেলে,—আফিসে হিসেব-কেতাবের কাজ করি,—সাহেবরা আমাদের সঙ্গে বাবু বলে কথা কয়,—আমাদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার কর্ত্তে ব্যাটাদের সাহস কি? যেদিন অপমান কর্ব্বে, সেদিন আমাদের কাছেও অপমান হবে না! গালাগালি অমনি দিলেই হ'ল! বেটাকে রূল-পেটা করে' তখনি চাক্‌রীতে ইস্তফা দিয়ে চলে আস্‌ব না!” সরমা হাসিয়া তীব্রস্বরে বলিত, “হ্যাঁ—হ্যাঁ, রেখে দাও না বাবু; তোমার যা বীরত্ব আমি জানি। তাই আফিস থেকে এসে, রোজ বাড়ীতে বসে ছোট-সাহেবের মুণ্ডুপাত কর,—আর এই বাগবাজারে বসে গাল দিলে সাহেব কিছু চৌরঙ্গী থেকে শুন্‌তে পাবে না জেনে, বেশ নিরাপদে মনের সাধ মিটিয়ে তাকে যাচ্ছে-তাই গালমন্দ দাও! কই একদিনও ত তার সাম্‌না-সাম্‌নি মুখের উপর একটা কড়া জবাব দিয়ে চাক্‌রী ছেড়ে চলে আস্‌তে পার না?” তখন বাবু আর সহ্য করিতে পারিতেন না,—ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া বলিয়া উঠিতেন, “চাক্‌রী ছেড়ে দিয়ে এলে, আর আমার পিণ্ডি চট্‌কে গিলবে কোত্থেকে তখন? বাপের বাড়ী থেকে কি মাসহারা বরাদ্দ করে এসেছ?” তর্ক যখন

এইরূপে ক্রমশঃ ব্যক্তিগত কলহে পরিণত হইত, এবং স্ত্রীর পিতৃ-গৃহের দৈন্যের উল্লেখ করিয়া, দুর্ব্বৃত্ত যখন পত্নীকে ইতরের মত কটু কথা বলিয়া, অপমানের অসহ্য কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিতে একটুও দ্বিধা বোধ করিত না, নিরুপায়া সরমা তখন নীরবে নতমুখে অশ্রুপাত করিত।

৬

সেই রাত্রিতে দাদাঠাকুর আসিয়া মাতঙ্গিনীর মাথা হইতে রক্তপড়া বন্ধ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার জ্ঞান ফিরাইতে পারেন নাই। সকালে কৈবর্ত্তের মেয়ে নেত্যর মা আসিয়া দেখিল, দীনু মাইতির ঘরে সারি-সারি তিনটি বিছানা পড়িয়াছে। একটীতে দীনু নিজে জ্বর-বিকারে শয্যাশায়ী, আর একটীতে তাহার আহত পত্নী মাতঙ্গিনী এখনও অজ্ঞান, অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে; অপর একটীতে নারায়ণ ও পুঁটি সেদিন রাত্রে আদুড়-গায়ে জলে ভিজিয়া আসিয়া অবধি জ্বরে পড়িয়াছে। কে কাকে দেখে, কে কার মুখে জল দেয়। অমন যে পাড়া-কুঁদুলী নেত্যর-মা,—সেও আজ মনিবের কাজে আসিয়া যখন এখানের এই অবস্থা দেখিল, তখন তাহারও মুখ দিয়া একটা আন্তরিক সহানুভূতিসূচক 'আহা' বাহির হইয়া গেল।

নিজের বার-মাস হাঁপানী কাশীর ব্যায়রামের অজুহাতে

মাতঙ্গিনী ঘরের কাজ-কর্ম্মের সুবিধার জন্য অল্প বেতনে এই 'নেত্যর-মাকে' নিযুক্ত করিয়াছিল। কথিত আছে যে, ইহার নিদারুণ বাক্যবাণে মর্ম্মাহত হইয়া ইহার একমাত্র বিধবা কন্যা, নৃত্যমণি না কি কাঁচা বয়সে অহিফেন-সেবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল! সে যাহা হউক, তাহার "পাড়া-কুঁদুলী" নামটা কিন্তু সে বর্ণে-বর্ণে সার্থক করিয়া তুলিয়াছিল। যথার্থই 'নেত্যর-মা' লোকের বাড়ী বহিয়া গিয়া ঝগড়া বাধাইয়া আসিত; এবং এখনও তাহার সে অভ্যাসটী পূর্ণমাত্রায় আছে। মাতঙ্গিনী ভিন্ন গ্রামের মধ্যে আর কেহ ইহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। সেই নেত্যর-মা ওরফে মঙ্গলা দাসীর মুখ দিয়া যখন 'আহা' বাহির হইয়া গেল, তখন দীনু মাইতির ঘরের যে খুব হৃদয়-বিদারক শোচনীয় অবস্থা, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। উঁকি মারিয়া-মারিয়া বার-কয়েক সে সকলকেই দেখিয়া আসিল; তার পর কে জানে কোন্ অলক্ষিত শত্রুকে সমস্ত সকালটা গালি দিতে-দিতে সে দীনুর ঘরের সমস্ত কাজগুলি সারিল। গাই দুহিয়া দুধ জ্বাল দিয়া সজ্ঞান রুগী কয়টীকে খাওয়াইল; কিন্তু মাতঙ্গিনীকে কিছুতেই এক পলা দুধও খাওয়াইতে না পারিয়া, বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার রোগের চৌদ্দপুরুষান্ত করিতে-করিতে, গাঁয়ের জমীদার-বাবুর পারিবারিক চিকিৎসক কবিরাজ শ্রীচিন্তামণি কবিভূষণ ধন্বন্তরী ভৈষজ্য-রত্নাকর মহাশয়ের কুটীরে গিয়া দেখা দিল।

"বলি হ্যাঁগা কোব্‌রেজ মশাই! তুমি কেমন ভালমানুষের ছেলে গা? তোমার একটু আক্কেল-বিবেচনা নেই? বলি, সমস্ত লাজ-লজ্জার মাথা কি ওই ওষুধের থলে মেড়ে পানের রসে গুলে খেয়েছ' বাছা? দীনুর বাড়ীটা যে কাল রাত থেকে একটা হাঁসপাতাল হয়ে রয়েছে, তা কি একবার উঁকি মেরেও দেখে আস্‌তে পারনি,—একটা খবরও নিতে পারনি! না হয় হলেই বা তুমি জমীদার-বাবুর মাইনে করা লোক গো,—তা'বলে কি গরীবদের ব্যামো হলে আর দেখ্‌বে না? এ আবার কি ঢং,—এতো আমার বাপের জন্মেও কখন শুনিনি! আর এই যদি কর্ব্বে, তবে কার শ্রাদ্ধ কর্ত্তে মরতে আমার মাথা মুণ্ডু এই চিকিচ্ছি-বিদ্যেটা শিখে—ওই ছাই-পাঁশের বড়ি-পাঁচনগুলো মুটো মুটো টাকা নিয়ে সৃষ্টির লোককে দিয়ে বেড়াও শুনি?" বলিতে-বলিতে নৃত্যর-মা একেবারে কবিরাজ মহাশয়ের বসিবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কবিরাজ এই নৃত্যর-মাটীকে বেশ চিনিতেন; তৎক্ষণাৎ চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া, জুতাটা পায়ে দিতে-দিতে বলিলেন, "এই চল বাছা যাই,—আমিও বেরুচ্ছি আর তুমিও এসেছ। তা ভালই হয়েছে, চল। এই একটু আগে দাদাঠাকুর নিত্যপূজা সারতে এসে, আমাকে খবর দিয়ে গেলেন,—চল যাই, এখনি গে দেখে আসি।" সারাটা পথ বকিতে-বকিতে নেত্যর-মা কবিরাজ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া চলিল।

মাতঙ্গিনীর জ্ঞান আর ফিরিল না। সমস্ত আয়ুর্ব্বেদসাগর

মন্থন করিয়াও, কবিরাজ শ্রীচিন্তামণি কবিভূষণ ধন্বন্তরী ভৈষজ্য-রত্নাকর সেদিন এমন কোনও ঔষধামৃত আবিষ্কার করিতে পারিলেন না, যাহাতে দীনুর এই হৃতচৈতন্য পত্নীটী পুনঃসঞ্জীবিত হইতে পারে। তবে তিনি তাঁর অসাধারণ নাড়ীজ্ঞান হইতে এটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ এই অভাগিনীর পরমায়ু প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে ; এবং এ কথা যদিও তিনি কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলেন নাই, তথাপি কি-জানি কোন্ এক অদ্ভুত উপায়ে শেষটা সকলেই জানিতে পারিয়াছিল যে, কবিরাজ মহাশয় বহুপূর্ব্বেই এরূপ যে হইবে, তাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন। সুতরাং সেদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে মাতঙ্গিনীর নিঃসংজ্ঞ প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে জমীদার-বাটীর এই ধন্বন্তরী ভৈষজ্য-রত্নাকরটীর অত্যাশ্চর্য্য নাড়ীজ্ঞানের প্রশংসায় সমস্ত গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিল।

নিষ্কর্ম্মা হতভাগা ছোঁড়ার দল গামছা-কাঁধে কোমর বাঁধিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—মাতঙ্গিনীকে শ্মশানে লইয়া যাইবে। গ্রামের যে সকল ছোক্‌রার সহিত তথাকথিত বিশিষ্ট সজ্জনগণ তাঁহাদের দৈনন্দিন সাধারণ জীবনে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতেও অপমান বোধ করেন, একমাত্র তাহারাই দেখিতে পাই—দেশ-বাসীর এমনই দুর্দ্দিনে প্রসারিত-করে গ্রামের বিপন্ন দুঃস্থগণের দ্বারে বুকভরা সহানুভূতি ও সমবেদনা লইয়া অযাচিতভাবে আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের ও দুঃখের বিষয় যে, সেই

তথাকথিত বিশিষ্ট সজ্জনগণের অধিকাংশেরই চুলের টিকিটিও সে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না! উৎসবের দিনেও তাহারাই আসিয়া না কোমর বাঁধিলে, অতিথি-অভ্যাগতদের অনাহারে ফিরিয়া যাইতে হয়। তাই তাহারা নিজেদের গ্রামের মান সম্ভ্রম, নিজেদের গ্রামের সুনাম বজায় রাখিতে অনেক সময় অনিমন্ত্রিতও আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং খাটিয়া-খুটিয়া প্রাণপাত পরিশ্রমে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য্য সমাধা করিয়া দিয়া, একটা ধন্যবাদেরও অপেক্ষামাত্র না করিয়া চলিয়া যায়। আজিও দীনুর এই মহাবিপদে তাহারাই সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিয়াছে,—কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে হয় নাই।

দীনুর জ্বরের প্রকোপ তখন অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উত্তাপের একেবারে উপশম হয় নাই। প্রাঙ্গণে প্রশ্ন উঠিয়াছে, 'শবের মুখাগ্নি করিবে কে?' এ কথা তাহার কাণে পৌঁছিতেই, একটা প্রবল চেষ্টায় সে শয্যা ছাড়িয়া, টলিতে-টলিতে প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া আসিল। মাতঙ্গিনীকে তখন বাঁশের খাটে শোয়ান হইয়াছে; এবং দাদাঠাকুর যথাশাস্ত্র অপঘাত-মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা করিতেছেন। গাঁয়ের সমস্ত সিঁদূর ও আল্‌তা আজ স্বামীর অগ্রগামিনী এই সৌভাগ্যবতী আয়তী নারীর মাথায় ও পায়ে আসিয়া জড় হইয়াছে। সহসা দীনুকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া সকলে হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। দুই-একজন গিয়া সত্বর তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। কেহ বলিল, "তুমি

কেন উঠে এলে দীনু খুড়ো—যাও, শোও গে যাও।" কেহ বলিল, "ও কি দীনু-দা! আমরা যখন এয়েছি, তখন সব ব্যবস্থা করে নেবো,—তোমার ব্যস্ত হবার কোন দরকার নেই। যাও ভাই, ঘরের ভেতর যাও,—ছেলে-মেয়ে দুটোকে আগ্‌লাও গে।" রক্তজবার মত দু'টো রাঙা চোখ দিয়া দীনুর তখন অনর্গল অশ্রু-ধারা ছুটিতেছিল। বুকফাটা করুণ রোদনের সঙ্গে পাগলের মত দীনু বলিতে লাগিল, "নারাণের অসুখ করেছে, পুঁটিরও জ্বর,—ওরে তাদের কাউকে তোরা ঘাটে নিয়ে যাস্‌নে,—তাহ'লে তারা আর বাঁচবে না, মরে যাবে। ওরে, আমি যাব তোদের সঙ্গে, চল্‌ তোরা—আমাকেও নিয়ে চল্‌; আমি যাব, আমি আগুন দোবো, আমি পোড়াব, আমি জ্বাল্‌ব, আমাকেও জ্বালিয়ে দিবি চ'।" এইরূপে শোকের আঘাতে ও রোগের প্রকোপে দীনুর কথাগুলো যখন নিছক প্রলাপে দাঁড়াইতেছিল, তখন পশ্চাৎ হইতে এক চিরপরিচিত স্নেহ-কোমল স্নিগ্ধ-সজল, বেদনাতুর কণ্ঠের আবেগ-ভরা ডাক আসিল, "ঠাকুরপো! ছিঃ ভাই, তুমি না ব্যাটাছেলে! তোমার কি এ সময় অমন কাতর হ'লে চলে?" সচকিতে দীনু ফিরিয়া দেখিল, মতির হাত ধরিয়া মমতাময়ী বৌঠাকুরাণী যেন মূর্ত্তিমতী অনুকম্পার মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই আপনার জনটীকে পাইয়া দীনু এবার বালকের মত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে বৌঠান!" ক্ষ্যান্তমণি জননীর মত অসীম স্নেহে দেবরের চোখ দু'টি মুছাইয়া দিয়া আপনার চক্ষু

মার্জ্জনা করিলেন। কত না প্রবোধ বচনে ভুলাইয়া, ধীরে-ধীরে দীনুকে হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া, শয্যার উপর শোয়াইয়া দিলেন। শ্মশান-যাত্রীদের ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, "তোমরা বাছা মতিকে নিয়ে ঘাটে যাও,—ওকে দিয়েই কোন রকমে কাজটা সেরো,—এ অবস্থায় এদের কাউকে আমি মেরে ফেল্‌তে পাঠাতে পার্ব্ব না।"

হরিবোল দিতে-দিতে শ্মশান-যাত্রীরা শবদেহ তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল ; এবং 'নেত্যর-মা' যমরাজের চতুর্দ্দশ পুরুষের নরকের ব্যবস্থা করিতে-করিতে চারিদিকে গোবর-জল ছড়াইয়া দিতে লাগিল।

৭

দিন-দুই পরে একদিন জমীদার-বাবুর নাড়ী টিপিতে-টিপিতে কবিরাজ শ্রীচিন্তামণি কবিভূষণ বলিতেছিলেন, "উত্তম! নাড়ীর গতি অতি স্বাভাবিক! বায়ু পিত্ত কফ্ তিনটিই বেশ সরল। শরীরে ব্যাধির কোনও লক্ষণই নাই। ঈশ্বর ইচ্ছায় আপনার স্বাস্থ্য অটুট থাকুক,—আপনি নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবী হইবেন।" সহাস্য প্রফুল্লমুখে জমীদার-বাবু বলিলেন, "সে আপনারই ধন্বন্তরী-ব্যবস্থার অনুগ্রহে!" তার পর কবিরাজ মহাশয় আরও একটু অধিকতর তোষামোদের সুরে বলিতে লাগিলেন, "আপনার

শ্রীচরণে আমার একটী নিবেদন আছে, যদি অভয় পাই জ্ঞাপন করি, নচেৎ—" একগাল হাসিতে-হাসিতে জমীদার-বাবু বলিলেন, "সে কি কবিরাজ মশাই, আপনার অনুরোধ আমি শুন্‌বো না, এ কি কথা হল? আপনার দয়ায় যে বেঁচে আছি!" দুই হাত জোড় করিয়া বারবার কপালে ঠেকাইয়া, কবিরাজ মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "সমস্তই নারায়ণের ইচ্ছা! আমি কে? শুধু উপলক্ষমাত্র। আমাকে আপনাদের চিরানুগত দাসানুদাস বলেই জান্‌বেন! কিন্তু সে যা হ'ক, এখন আমার বক্তব্যটুকু হুজুরের কাছে নিবেদন করিতে পারি কি না, আজ্ঞা করুন!" জমীদার-বাবু শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "অবশ্য পারেন! অবশ্য পারেন! এখনি আজ্ঞা করুন কি কর্‌তে হবে,—আমি সাধ্যমত আপনার অনুরোধ রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা কর্ব্ব জান্‌বেন।" "আহা-হা, সে আর আপনাকে বল্‌তে হবে না—বল্‌তে হবে না। আপনি এ অধমকে কতখানি স্নেহ করেন, তা বিলক্ষণ জানি। আর তা জানি বলেই, সেই সাহসেই আজ আপনার কাছে এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে অগ্রসর হয়েছি।" বলিতে-বলিতে কবিরাজ মহাশয় ধীরে-ধীরে একটী সোণার ঘড়ি-ঘড়ির-চেন বাহির করিয়া প্রভুর সম্মুখে রাখিলেন। জমীদার-বাবু তাঁহার অপহৃত ঘড়ি ও চেন চিনিতে পারিয়া বিস্মিত-দৃষ্টিতে কবিরাজ মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। মৃদু-মৃদু হাস্য করিতে-করিতে কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "অবশ্য, এ কার্য্য যে

আমার দ্বারা হয় নাই, সে কথা বোধ হয় আপনার নিকট আমাকে আর শপথ করে বল্‌তে হবে না, তবে ঘটনাটা হয়েছিল এইরূপ—” বলিয়া কবিরাজ মহাশয় একে-একে দীনুর মুখ হইতে বিকারের ঝোঁকে ঘড়ি-চেনের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া ও মাণ্‌কের-মার সাহায্যে দীনুর মৃত-পত্নীর সিন্দুক হইতে তাহার উদ্ধার ও মাণ্‌কের-মার সদ্‌যুক্তি ও পরামর্শ এবং অনুরোধ মত উহা গোপনে জমীদার মহাশয়কে প্রত্যর্পণ; দীনুর এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিবার জন্য মাণ্‌কের-মার ও তাঁহার নিজের সানুনয় প্রার্থনা— প্রভৃতি সমস্ত সবিস্তারে তাঁহার গোচর করিয়া তিনি প্রভুর মুখের একটা অভয় বচন ভিক্ষা করিলেন।

জমীদার মহাশয় বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ভৈষজ্য-রত্নাকরকে আরও অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া—বহুবিধ প্রশ্ন ও জেরার পর যখন পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল রেষারিষির উপর ও অল্পমতি স্ত্রীর প্ররোচনায় জ্ঞাতি-শত্রুতা সাধন করিবার মহদুদ্দেশেই দীনুর মত একজন পুরাতন ও বিশ্বস্ত মুহুরী যদিচ এইরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে কখনও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অথবা সোণার একটা ঘড়ি-ঘড়ির-চেন পাইবার আশায়, কিংবা একমাত্র নিছক চুরির উদ্দেশেই হঠাৎ এরূপ অসাধু কার্য্যটা করে নাই,—তখন তিনি কবিরাজ মহাশয়কে অভয় দিয়া সমস্ত আইন-আদালতের ধারা অগ্রাহ্য করিয়া দীনু মাইতির অপরাধ সর্ব্বান্তঃকরণে মার্জ্জনা করিলেন;

এবং তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা দূরে থাক, বরং এই বুদ্ধিমান্ আমলাটীর অতঃপর আরও কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। তবে দীনুর এই ব্যাপারে মাঝখান হইতে অনর্থক শ্রীমন্ত সর্দ্দারের মত একটা উপযুক্ত লোক যে জমিদারী সেরেস্তার হাতছাড়া হইয়া গেল, এজন্য যেন একটু বিশেষ ভাবেই তিনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা প্রভুভক্ত কবিরাজ মহাশয় শীঘ্রই শ্রীমন্ত সর্দ্দারকে অতি অবশ্য ফিরাইয়া আনিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া জমীদার প্রভুর পুনঃ-পুনঃ দীর্ঘ জীবন ঘোষণা করিতে-করিতে হাসিমুখে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

৮

কবিরাজ শ্রীচিন্তামণি কবিভূষণ ধন্বন্তরী ভৈষজ্য-রত্নাকরের আন্তরিক যত্ন ও সুচিকিৎসায় এবং ক্ষ্যান্তমণির দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে দীনু যেদিন নীরোগ হইয়া প্রথম পথ্য করিল, ক্ষ্যান্তমণি জ্বরাসুর, মা মঙ্গলচণ্ডী ও গাঁয়ের সিদ্ধেশ্বরী তলায় পূজা পাঠাইয়া দিল; এবং বৈকালে নেত্যর-মাকে ডাকিয়া ঘর-সংসার বুঝাইয়া দিয়া, পুঁটীকে কোলে করিয়া, নারায়ণকে চুম খাইয়া, মতির হাত ধরিয়া গৃহে ফিরিবার উপক্রম করিল। তখন নারায়ণ ও পুঁটি কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিতে লাগিল, "জ্যাঠাইমা, আমরাও যাব তোমার সঙ্গে—আমাদেরও নিয়ে চল।" দীনু ঘরের ভিতর

হইতে নেত্যর-মাকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে মঙ্গলা,—তুই এক কাজ কর—'যোদো'কে বল্ বড় গাড়ীখানায় বলদ জোড়াটাকে জোয়াল দিক্—আজ দিনটাও ভাল আছে—আমরা সবাই মিলে যাই পুরানো বাড়ীতে।" তার পর আস্তে-আস্তে বাহিরে আসিয়া —গমনোন্মুখ বৌঠাকুরাণীর পা দুইটা একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া, সে একান্ত নিরুপায়ের মত অঝঃঝরে কাঁদিতে লাগিল। পূর্ব্বকৃত অপরাধের অনুতাপে এতদিন তাহার অন্তর দগ্ধ হইতেছিল; আজ চক্ষের জলে বৌঠাকুরাণীর পা দু'টী ভিজাইয়া সে যেন কতকটা শান্তি পাইল—করুণ মিনতি-পূর্ণ কণ্ঠে অপরাধীর মত কাকুতি করিয়া বলিতে লাগিল, "বৌদি, আমায় মাপ কর, তোমার দু'টী পায়ে পড়ি—এমন করে আর আমার কঠিন শাস্তি কোরো না,—আমাকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে দাও।" অসীম মমতাময়ী ক্ষ্যান্তমণি পুত্রাধিক এই দেবরের—আপনার স্বর্গগত স্বামীর বড় স্নেহ আদরের এই ভাইটীর আজ এই দীনতা, এই আকুলতা দেখিয়া—আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি পায়ের কাছ হইতে দীনুকে হাত ধরিয়া তুলিয়া, তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিবার সময় বারবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল, স্বামীর সেই প্রবোধ বাক্য—"ওরে মাণ্‌কের-মা! দীনু কি আমাদের পর রে?"

শরীরে একটু বল পাইবামাত্র দীনু নিজে গিয়া কলিকাতা হইতে মাণিক ও শ্রীমন্ত সর্দ্দারকে সঙ্গে করিয়া দেশে ফিরাইয়া

আনিল। মাণিকের মনিব কেরাণীবাবুটী সম্প্রতি আফিসের সাহেবের নিকট অপমানিত, লাঞ্ছিত ও কর্ম্মচ্যুত হইয়া বাড়ীতে বেকার বসিয়াছিলেন; সুতরাং মাণিককে কাজ ছাড়িয়া আসিতে আর অধিক বেগ পাইতে হয় নাই। সরমা চক্ষের জল মুছিতে-মুছিতে তাহার পাওনা-গণ্ডা হিসাব করিয়া স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও গোপনে মাণিকের হাতে বুঝাইয়া দিয়াছিল। মাণিক আসিয়া যখন মায়ের পায়ের কাছে দুই মাসের মাহিনা নগদ তিনটাকা ও একজোড়া নূতন কাপড় রাখিয়া প্রণাম করিল, তখন ক্ষ্যান্তমণির দুই চোখ বাহিয়া আবার একবার শ্রাবণের ধারা ঝরিতে লাগিল।

চতুর্ব্বেদাশ্রম

তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা। ভারতের উত্তরার্দ্ধকে তখন আর্য্যাবর্ত্ত বলা হইত। সে সময় ব্রাহ্মণের তপস্যার তেজ ছিল, ক্ষত্রিয়ের বাহুতে বীর্য্য ছিল, বৈশ্যের বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বসতি ছিল এবং শূদ্রের দাসত্বে সেবার ত্রুটী হইত না।

আর্য্যাবর্ত্তের সেই গৌরবের দিনে স্বামী ত্রিগুণাচার্য্যের চতুর্ব্বেদাশ্রমে ছাত্র সংখ্যা অগণিত ছিল। মহাপণ্ডিত ত্রিগুণাচার্য্য দশ বৎসরকাল নানা দেশের অসংখ্য ছাত্রকে বেদাধ্যয়ন করাইয়া সহসা একদিন ইহলোক মুক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। ত্রিগুণাচার্য্যের পুত্র ছিল না। তিনি তাঁহার বিধবা পত্নী ও দুইটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন।

ত্রিগুণাচার্য্যের মহাপ্রস্থানের পর তাঁহার চতুর্ব্বেদাশ্রম শূন্য হইয়া পড়িল। তাঁহার প্রধান ছাত্র পুণ্ডরীক যখন চতুর্ব্বেদ সাঙ্গ করিয়া গুরুর নিকট গৃহিতানুজ্ঞ হইয়া সমাবৃত্ত লাভ করিয়াছিল তখন তিনিই তাহাকে উপদেশ দিয়া অপর একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। সুতরাং বিদ্যার্থী ছাত্রের দল তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অন্যান্য গুরুর শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইল। কেবল একটী মাত্র ছাত্র কোথাও নড়িতে পারিল না—সে বিনায়ক।

অনাথ ব্রাহ্মণ বালককে অপুত্রক ত্রিগুণাচার্য্য অনেক আশা করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাহাকে দ্বিতীয় প্রধান শিষ্য করিবার জন্য তিনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। কিন্তু হতভাগ্য বিনায়কের অদৃষ্টে তাহা সহিল না। ত্রিগুণাচার্য্য ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন, বিনায়কেরও বেদশিক্ষা সম্পূর্ণ হইল না।

ত্রিগুণাচার্য্যের বিধবা পত্নী আর্য্যা মায়াদেবী বিনায়ককে অনেক বুঝাইলেন। অন্যত্র গিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অনেক মিষ্ট উপদেশ দিলেন।

এই প্রিয়বাদিনী রমণী দেশ বিশ্রুত কবি রঘুপতি দেবের একমাত্র কন্যা। কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র মহাকবি রঘুপতি দেব তাঁহার ভাণ্ডার শূন্য করিয়া এই প্রাণাধিকা দুহিতাকে শিখাইয়াছিলেন। মেধাবিনী মায়াদেবী তাহার একটী বর্ণও আজিও ভুলেন নাই। সে অনেক দিনের কথা—একদা যেদিন অবিবাহিত যুবক ত্রিগুণাচার্য্য কবি রঘুপতির গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কন্যার মুখে তদ্বিরচিত কবিতার সুললিত আবৃত্তি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই ঘোর বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ যুবক এ জগতকে মায়া এবং এ সৃষ্টিকে প্রপঞ্চ জানিয়াও সেদিন ব্যাকুল হইয়া এই কন্যাটীর পাণি-প্রার্থী হইয়াছিলেন। মায়াদেবী সেদিন তাঁহার পিতৃগৃহের এই তেজঃপুঞ্জ কলেবর প্রেমার্ত্ত নবীন অতিথিটিকে বিমুখ করেন নাই। তাঁহার রূপ-সমুজ্জ্বল কাব্যালঙ্কার লইয়া ত্রিগুণাচার্য্যের চতুর্ব্বেদাশ্রম মণ্ডিত করিতে আসিয়াছিলেন।

বিনায়ক কতদিন মায়াদেবীকে তাঁহার কন্যাদ্বয়কে শিক্ষা দিতে শুনিয়াছে। এই মন্ত্র-মুগ্ধ ব্রাহ্মণ বালক তাহার ঋগ্বেদ বন্ধ করিয়া মায়াদেবীর মুখে সুছন্দ কবিতার মধুর আবৃত্তি ও তাহার সুচারু ব্যাখ্যা বিহ্বল হইয়া শুনিত। মাতা ও কন্যাদের কাব্যালোচনা শুনিতে শুনিতে বালকের প্রাণের ভিতর এই ললিত কাব্যকলা শিক্ষা করিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা উথলিয়া উঠিত। তাই আজ মায়াদেবী যখন তাহাকে বেদপাঠ সম্পূর্ণ করিবার জন্য অন্যত্র যাইতে উপদেশ দিলেন, বিনায়ক অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল।

চতুর্ব্বেদাশ্রমের ক্রোড়ের উপর দিয়া খরস্রোতা 'সুনন্দা' তরতর করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। বিনায়ক তাহার আন্দোলিত হৃদয় লইয়া এই সুনন্দা তীরের এক ঘনপত্রাচ্ছাদিত কিংশুক তরুমূলে গিয়া উপবেশন করিল। সেদিনের অপরাহ্নটী বেশ নির্ম্মল। স্নিগ্ধ মলয়পরশ অন্তর সরস ও দেহ রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিতেছে। কেবল বিনায়কের অন্তরে সেদিন বিষম দ্বন্দ্ব চলিতেছিল—বেদপাঠ সম্পূর্ণ করিবার আবশ্যক কি? কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করি না কেন?

মায়াদেবী কন্যাদের নাম রাখিয়া ছিলেন দ্যুতি ও মেখলা। দ্যুতি সকলের অজ্ঞাতসারে তাহার পঞ্চদশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল এবং মেখলা নির্ব্বিঘ্নে চতুর্দ্দশে পদার্পণ করিয়াছিল। দ্যুতির দেহ সুস্থ ও সবল; সে পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ। আশ্রমের

সমস্ত কঠিন কার্য্যগুলি সে স্বেচ্ছায় আপন হাতে তুলিয়া লইয়াছিল। মেখলা তাহা পারে না। সে সুস্থ বটে কিন্তু সবল নয় তাই দ্যুতি তাহাকে আশ্রমের ছোটখাট হাল্‌কা কাজগুলি ভাগ করিয়া দিয়াছিল।

নিত্য প্রভাতে উঠিয়া ঊষাস্নানান্তে পট্টাম্বরী পরিয়া বেদগাথা গাহিতে-গাহিতে সাজি হাতে মেখলা বন হইতে বনান্তরে কুসুম চয়ন করিয়া বেড়াইত। বড় যত্ন করিয়া সে আশ্রম মৃগগুলিকে পালন করিত। প্রতিদিন অপরাহ্ণে সে তাহার ক্ষীণ কটিতে বসন বাঁধিয়া কানন তরু তৃণের মূলে মূলে জলসেক করিয়া ফিরিত। মেখলার সুঠাম দেহলতা—তাহার কনক-অঙ্গের স্নিগ্ধ-লাবণ্য সকলেরই নয়নরঞ্জন করিত।

বিনায়ক বেদপাঠ সম্পূর্ণ করিবার জন্য অন্য কোথাও যাইতে কিছুতেই মনকে সম্মত করাইতে পারিতেছে না। এমন সময় কুঞ্জকক্ষে মেখলা আসিয়া ডাকিল, "বিনায়ক!" বিনায়ক সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। মেখলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এখানে একলাটী বসে কি ভাব্‌ছ? আমায় আজ একটী কলসও জল তুলে দিলে না। আমি একা জল তুলে তুলে শ্রান্ত হয়ে পড়িছি।" মেখলা কলস ভূমিতে নামাইয়া রাখিল, কটি হইতে অঞ্চল খুলিয়া রক্তিম চারুললাটের স্বেদ-মুক্তাবিন্দুগুলি মুছিয়া লইয়া কিংশুক তরুতলে বিনায়কের পরিত্যক্ত স্থানটী বেশ গম্ভীর ভাবে অধিকার করিয়া বসিল। বিনায়ক তখন মানসিক

দুশ্চিন্তায় নিযুক্ত থাকায় আজ তাহাকে জলসেকে সাহায্য করিতে যাইতে পারে নাই বলিয়া মার্জ্জনা চাহিতেছিল। মেখলা মৃদু হাসিয়া তাহার মানসিক বিপর্য্যয়ের কারণটা কি জিজ্ঞাসা করিল। বিনায়ক তাহার সমস্ত দুশ্চিন্তাগুলিকে অকপটে মেখলার সম্মুখে বাহির করিয়া ধরিল। কি জানি কেন ইদানীং এই মেয়েটীর কাছে বিনায়ক তাহার কিছুই লুকাইয়া রাখিতে পারিত না। মেখলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "এর জন্য তোমার এত ভাবনা! তা আমাকে একবার বল্লেইত' হ'ত যে 'বেদে আর আমার রুচি নাই,—কবিতা আর অলঙ্কারের জন্য আমার প্রাণ কাঁদছে!'—তা চল এখন কুটীরে চল।" মেখলা উঠিয়া দাঁড়াইল, বিনায়ক কলসটী তাহার কক্ষে তুলিয়া দিল। মেখলা বলিল, "আমি মাকে বলে সব ব্যবস্থা করে দেব এখন, তুমি আর ভেব না, বেদ শিখ্‌তে তোমাকে এখান থেকে আর কোথাও যেতে হবে না।" এই বালিকার মুখের অভয়বাণী বিনায়কের অস্থির চিত্তকে কতকটা নিশ্চিন্ত করিয়া দিল।

ইহারই দুই একদিন পরে মেখলা একদিন তাহার জননীকে বলিতেছিল, "মা! বিনায়ক বেদ শেষ কর্ব্বার জন্য আর কোথাও যেতে রাজি নয়।" মায়াদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" "সে বল্‌ছিল তোমার কাছে কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র ভাল করে শিখ্‌বে।" মায়াদেবী অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তবে তাই শিখুক, ওর যখন বেদপাঠে আর প্রবৃত্তি নেই তখন আর মিছে

কেন সেজন্য ওকে অন্যত্র পাঠাব।" এই কোমলহৃদয়া নারী কাহাকেও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কর্ম্মে লওয়াইতে প্রয়াস পাইতেন না।

সেদিন রাত্রে শয়ন করিবার সময় দ্যুতি মেখলাকে বলিল, "বিনায়কের বেদ শিখ্‌তে না যাওয়াটা ভাল হ'ল না।" মেখলা বলিল, "কেন তাতে তার কি হয়েছে? ওতো মার কাছে কাব্য আর অলঙ্কার শাস্ত্র শিখ্‌বে।"

"তা শিখুক কিন্তু বেদটা শেষ করতে পাল্লে ওর ভাল হত।"

"কেন এতেই বা ওর মন্দটা কি হবে? কাব্যে ওর বরাবরই একটা দখল আছে আর অলঙ্কার শাস্ত্র শেখবার একটা প্রবল ঝোঁকও আছে, তা ছাড়া শিল্পকলায় ওর বেশ হাত আছে; কি সুন্দর মাটীর প্রতিমূর্ত্তি গড়ে দেখেছ'ত?"

"তা হ'ক্, বেদ শিখ্‌তে যাওয়াটাও ওর প্রয়োজন ছিল।"

"কিচ্ছু না। বরং না যাওয়াটাই আমাদের পক্ষে বেশী প্রয়োজন। তবু আশ্রমে আমাদের দেখ্‌বার শোন্‌বার একজন লোক থাকৃবে।"

"কিছু আবশ্যক নেই। ও গেলে আমাদের কোন ক্ষতি হ'ত না; আর একজনত' রয়েছেন, প্রায়ই এসেত' আমাদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন।"

এইখানে বলিয়া রাখা উচিত যে এই একজন আর কেহই নহেন, স্বর্গীয় ত্রিগুণাচার্য্যের প্রধান শিষ্য পুণ্ডরীক। দ্যুতি এই

পুণ্ডরীকের বাগদত্তা পত্নী। বহুদিন হইতে ইহাদের বিবাহ স্থির হইয়া আছে। ত্রিগুণাচার্য্য সহসা দেহত্যাগ না করিলে এতদিন ইহাদের পরিণয় সম্পন্ন হইয়া যাইত।

মেখলা বলিল, "তিনি তাঁর আশ্রম নিয়েই ব্যস্ত। সকল সময় ত তাঁকে পাওয়া যাবে না, কখন কি আবশ্যক হবে কে জানে?"

দ্যুতি আর কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার মনে মনে এই কথাটা কেবলই উঠিতে লাগিল 'পুণ্ডরীকের নিকট বিনায়ক তাহার বেদ শিক্ষাটা সম্পূর্ণ করিলেই ভাল করিত। পুণ্ডরীকের চতুর্ব্বেদ কণ্ঠস্থ এবং সে যে বেদের নূতন ভাষ্য করিতেছে তাহা যে সম্পূর্ণ নির্ভুল হইতেছে, ইহা ভাবিয়া দ্যুতি অন্তরে অন্তরে সর্ব্বদাই একটা গৌরব অনুভব করিত।

প্রতি বৃহস্পতিবার গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া পুণ্ডরীক চতুর্ব্বেদাশ্রমের তত্ত্ব লইতে আসিতেন, এবং তিনি বেদের যে নূতন ভাষ্য করিতেছিলেন, তাহারই নবরচিত অংশটুকু মায়াদেবীকে শুনাইয়া যাইতেন। এই ভাষ্য লইয়া পুণ্ডরীকের সহিত বিনায়কের মাঝে মাঝে মহা তর্ক বাধিয়া যাইত। পুণ্ডরীকের ভাষ্যের নানা-স্থানে বিনায়ক আপত্তি করিয়া বসিত এবং বহুতর্কের পরও কিছুতেই তাহারা একমত হইতে পারিত না। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব ছিল না। পুণ্ডরীক কতদিন মায়াদেবী ও দ্যুতির নিকট অযাচিতভাবে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে এই অনাথ ব্রাহ্মণবালক অতীব বিচক্ষণ ও প্রখর বুদ্ধি-

শক্তি-সম্পন্ন। দ্যুতি বলিত, "তা'হক্ কিন্তু আপনার সঙ্গে বেদ নিয়ে তর্ক করাটা ওর মোটেই শোভা পায় না।" অবশ্য পুণ্ডরীক একথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিতেন না, বরং তাহাকে স্পষ্ট স্বীকার করিতেই হইত যে বিনায়কের পক্ষে সেটা শোভা পায় না বটে, কিন্তু তথাপি, তাঁহার উদার-হৃদয় বার বার অকপটে বলিত "এই প্রতিভাবান্ বালকের মধ্যে অনেক সৎপদার্থ আছে।" এই কথা শুনিয়া মেখলার অন্তঃকরণ পুণ্ডরীকের প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিত।

একখানি প্রশস্ত অজিনের উপর মায়াদেবী তাঁহার কন্যাদ্বয়কে লইয়া কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র শিক্ষা দিতে বসিতেন, এবং তাঁহার সম্মুখে একখানি কুশাসনের উপর বিনায়ক বসিত। মায়াদেবীর মধুর-মুরজ কণ্ঠে কাব্যের বিনোদ-আবৃত্তি ও সাস্ব বাক্যে তাহার সুললিত ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে, বিনায়ক যেন কোন এক স্বপ্ন-রাজ্যে গিয়া পড়িত। তাহার মনে হইত যেন বাণী ও কমলাকে লইয়া মহামায়া স্বয়ং তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন। তাঁহার আবৃত্তির কল-কাকলি-মন্দ্র-তার যেন বীণার তারে গান্ধারে-ষড়জে-মধ্যমে-ধৈবতে উঠিয়া পড়িয়া খেলিয়া বেড়াইত। সুকণ্ঠ বিনায়ক অতি অল্পদিনের মধ্যেই কাব্য আবৃত্তিতে মায়াদেবীর উভয় ছাত্রীকেই পরাস্ত করিল। হু' হু' করিয়া অলঙ্কার শাস্ত্র শিখিতে লাগিল। তাহার অদ্ভুত মেধা ও স্মরণশক্তি দেখিয়া মায়াদেবী বিস্ময়ে পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে 'শিক্ষা-

কল্প-ব্যাকরণ-নিরুক্ত-জ্যোতিস্‌-ছন্দস্‌'এ বিনায়ক ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিল।

একদিন মেখলা ছুটিয়া আসিয়া তাহার জননীকে একটা কিছু অপরূপ জিনিষ দেখাইবে বলিয়া টানিয়া লইয়া গেল। দ্যুতি তখন আপন মনে একখানা জীর্ণ বস্ত্রের সংস্কার করিতেছিল, মেখলা তাহাকেও ডাক দিল, "দিদি! শীগ্‌গির উঠে আয়, দেখে যা বিনায়ক কি সুন্দর মূর্ত্তি গড়েছে!" দ্যুতি উঠিল না, তাহার হাতের কাজ শেষ না হইলে সে উঠিতে পারিবে না বলিল, অগত্যা মেখলা একা তাহার জননীকে লইয়া গিয়া দেখাইল। মূর্ত্তিটি তাহাদের অধীত কাব্যের একটী পরিচ্ছদ হইতে গৃহীত। বিষয় "প্রথম সন্দর্শন!" মূর্ত্তিশিল্পী বিনায়ক অপরাধীর মত সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। লজ্জায় তাহার গণ্ডদ্বয় কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তিম হইয়া উঠিতেছিল।

মেখলা খুব উৎসাহের সহিত তাহার জননীকে বিনায়কের গঠিত মূর্ত্তির এইরূপ পরিচয় দিতেছিল, "ঐটি বেণুমতী তীরে দানব গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রম। ঐ আশ্রমের কুসুমিত কুঞ্জাভ্যন্তরে সদ্যস্নাতা দেবযানী সাজি-হাতে পূজার জন্য সদ্যবিকশিত পুষ্পরাজি চয়ন করিতেছে। দেবযানীর পিতার নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য বৃহস্পতি-সুত স্বর্গ হইতে আজ এই প্রথম পুষ্পবনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! কিশোর ব্রাহ্মণ! চন্দনে চর্চ্চিত ললাট! কণ্ঠে পুষ্পমালা—পট্টবাসপরিহিত, অধরে নয়নে যেন একটা প্রসন্ন সরল হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে!"

মায়াদেবী মূর্ত্তিটীর যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন যেন কি একটা দুশ্চিন্তায় ভরিয়া উঠিল। সহসা সেদিন যেন তিনি প্রথম দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার কন্যাটীর সমস্ত অন্তঃকরণ এই প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণ-বালকের প্রতি নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে!

মূর্ত্তিগঠন শিক্ষা করিবার জন্য হঠাৎ সেদিন মেখলা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহাকে এখনই একটা কিছু গড়িতে শিখাইবার জন্য বিনায়ককে সে মহা ব্যস্ত করিয়া তুলিল। অগত্যা বিনায়ক কিছু মৃত্তিকা লইয়া মেখলাকে তিম্বফলা, কপিত্থ, তিন্দুক প্রভৃতি ফল প্রস্তুতের প্রণালী শিখাইতে লাগিল। মেখলা একটী হরীতকী গড়িয়াই বলিল, "বাঃ এ ত বেশ সোজা! আমি এ অল্পদিন শিখ্‌লেই তোমার চেয়ে ভাল পুতুল গড়তে পার্‌বো, তুমি রোজ আমায় একটু করে শিখিয়ো।" বিনায়ক করুণহাস্যে মেখলার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "তোমায় শেখাতে পারি আমার এত বিদ্যা ত' নাই মেখলা!"

সেদিন রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া মেখলা দ্যুতিকে বলিল, "বিনায়কের পুতুলটী দেখ্‌লে না? কি সুন্দর যে গড়েছিল, কি বল্‌বো?" দ্যুতি বলিল, "আমার ও সব ভাল লাগে না।" মেখলা বলিল, "এটী যদি দেখ্‌তে তোমার খুব ভাল লাগ্‌তো, এ মূর্ত্তিটী তোমার একবার দেখা উচিত ছিল।" দ্যুতি এবার একটু রুক্ষ-ভাবে উত্তর দিল, "যতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে পুতুল দেখ্‌বো ততক্ষণে

আমার একটা কাজ সারা হবে। মাটীর পুতুল দেখে আর কি লাভ!" মেখলা এবার রাগিল, ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "খুব লাভ হ'ত। দু'ঘণ্টা হাঁ করে বসে পুণ্ডরীকের বেদের ভুল ভাষ্য শুনে তোমার যা লাভ হয়নি, তার চেয়ে অনেক বেশী লাভ হতে পারতো।" দ্যুতি তাহার ভাবী-পতির উপর এবং তাহার নিজের উপর মেখলার এই অযথা আক্রমণে মনে মনে খুব রাগিল বটে, কিন্তু আর কোনও উত্তর দিল না।

"বিনায়কের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! কাহারও নিকট কখনও শিখে নাই, তথাপি কি সুন্দর গড়িয়াছে!" মেখলা ইহাই ভাবিতে ভাবিতে নিঃশব্দে কখন ঘুমাইয়া পড়িল। তারপর নিশিশেষে সে একটা স্বপ্ন দেখিল। দেখিল সেই বেণুমতীর তীর! সেই কুসুমিত কুঞ্জবন! সেই কুঞ্জবনের অন্তরালে তরুণ অরুণের মত এক ব্রাহ্মণ-যুবক দাঁড়াইয়া আছে, সে যেন তাহাদেরই এই বিনায়ক!—আর যে বালিকা সাজি-হাতে পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়াছিল, তাহার মুখ যেন বড় চেনা চেনা! সে যেন মেখলাই নিজে নিত্য-পূজার ফুল তুলিতে আসিয়াছে!

*　　*　　*　　*

দেখিতে দেখিতে উত্তরায়ণ অতীত হইল। চতুর্ব্বেদাশ্রমে ইহারই মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন বিনায়কই মায়াদেবী ও তাঁহার কন্যাদ্বয়কে কাব্য পড়িয়া শোনায় ও তাহার সুললিত ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদের মুগ্ধ করিয়া দেয়। অলঙ্কার

শাস্ত্রের সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া তাহাদের চমৎকৃত করিয়া তোলে। মাঝে মাঝে বিবিধ ছন্দোবন্ধে সরস মধুর কবিতা রচনা করিয়া, তাহাদের শুনাইয়া প্রীত করিয়া দেয়। 'গায়ত্রী' 'মাতৃকা' 'সন্ধ্যা' প্রভৃতির মানসী প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া সে আশ্রম-চত্বরের এক অংশ পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। সেই সকল প্রতিমূর্ত্তির পাশে পাশে মেখলার হাতে গড়া ছোট ছোট হংস, মৃগ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণপতি প্রভৃতি মূর্ত্তিগুলিও সগর্ব্বে তাহাদের আসন অধিকার করিয়া থাকিত। দ্যুতি কতদিন তাহাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছে, "ওরে, ওগুলো ফেলে দিস্। ওর পাশে তোর মাটীর ঢেলাগুলো খাড়া করে রাখিস্নি!" মেখলা হাসিয়া বলিত, "তা হ'ক্, ও থাক্; গুরুর চেয়ে না হয় শিষ্যের ভাল হয়নি, তা বলে কি গুরুর পায়ের কাছেও একটু স্থান পাবে না!"

সেদিন বৃহস্পতিবার। পুণ্ডরীক আসিয়াছিল—তাহার বেদের ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। মায়াদেবী, দ্যুতি, মেখলা, বিনায়ক সকলে আজ তাহাকে ঘেরিয়া তাহার ভাষ্যের সমাপ্তি শুনিতে বসিয়াছে। পুণ্ডরীক কিয়দংশ পাঠ করিয়া অবশিষ্ট বিনায়ককে পড়িয়া শুনাইতে অনুরোধ করিল। মধুকণ্ঠে বিনায়ক যখন প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বক উদাত্তস্বরে বেদের স্তোত্রগুলি আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল তখন একটা অপূর্ব্ব সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত চতুর্ব্বেদাশ্রমের প্রতি ক্ষুদ্র কোণটা ধ্বনিত হইয়া উঠিতে লাগিল! বিনায়কের সেই পরিপূর্ণ মিষ্ট স্বর, সেই সুস্পষ্ট ওঙ্কার-উন্নাদ-বিন্দু মেখলার হৃদয়

তন্ত্রীতে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া তাহার বক্ষের ভিতর যেন একটা মধুরাগিণীর মোহিনী ঝঙ্কার বাজাইয়া গেল!

সেদিন রাত্রে মেখলা দ্যুতিকে ডাকিয়া বলিল, "দেখ, বিনায়ক পুণ্ডরীকের অপেক্ষা অনেক ভাল আবৃত্তি করিতে পারে!" দ্যুতি গম্ভীরভাবে বলিল, "তা হতে পারে; বেদ আবৃত্তির বোধ হয় তুমিই একমাত্র সুবিচারক!" মেখলা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না আমি তা বল্‌ছি না; তবে আমার যেন বিনায়কের আবৃত্তিই ভাল লাগ্‌ল!" দ্যুতি তেমনই ভারি গলায় উত্তর করিল, "তা হতে পারে; সকলের পড়াই যে সবার ভাল লাগ্‌বে এমন ত কোন কথা নাই!" দ্যুতির কণ্ঠের এই অভিমানের সুর মেখলার প্রাণে গিয়া আঘাত করিল। সে রাত্রে দুই ভগ্নীর কেহই যেন নিদ্রায় স্বস্তি পাইল না।

আজ কয়দিন হইল, বিনায়ক তাহার কাব্যালোচনা বন্ধ করিয়া নিবিষ্টচিত্তে একখানি চিত্র অঙ্কিত করিতেছিল। চিত্রখানি যে কি তাহা কাহাকেও বলে নাই, কাহাকেও দেখায় নাই। মেখলা ইতিমধ্যে অনেকবার আসিয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে 'আঁকা শেষ হইল কিনা' তাহার তাগাদা করিয়া গিয়াছে। তিন দিন পরে মায়াদেবীও আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া গিয়াছেন 'চিত্রখানি সমাপ্ত হইয়াছে কিনা?' দ্যুতি এ কয়দিন এ ধারেও আসে নাই; কিন্তু চারদিনের দিন সেও দুম্‌দুম্ করিয়া বিনায়কের ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ছবি লইয়া বিনায়কের আর কতদিন

ছেলেখেলা চলিবে জানিতে চাহিল। আজ চার দিন পড়াশুনা বন্ধ হইয়া আছে ইহা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল। বিনায়ক সভয়ে উঠিয়া বলিল, "আজই এটা আমার শেষ হয়ে যাবে, কাল থেকে আবার রীতিমত পড়া সুরু কর্‌বো!" দ্যুতি চলিয়া গেল। বিনায়কের কক্ষের ভিতর ক্ষণিকের জন্য যেন বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল।

ইহারই প্রহরার্দ্ধ পরে বিনায়ক তাহার চিত্রাঙ্কন সমাপ্ত করিয়া তুলিকা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নির্নিমেষ-নয়নে কিয়ৎক্ষণ আপনার চিত্রের পানে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, তার পর আরও কতক্ষণ কি ভাবিয়া সে চিত্রখানা হাতে করিয়া মেখলার সন্ধানে বাহির হইয়া গেল।

মায়াদেবী তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা দ্যুতি ও তাঁহার ভাবী-জামাতা পুণ্ডরীককে লইয়া আপন কক্ষে বসিয়া মৃদুস্বরে কি পরামর্শ করিতেছেন। সেই কক্ষের মধ্যেই কিছু দূরে একখানা মৃগচর্ম্মের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মেখলা আপন মনে একটা কবিতা রচনা করিতেছে! লেখনীর প্রান্তভাগ কুন্দদন্তপ্রান্তে চাপিয়া ধরিয়া, বাম করতলে শির বিন্যস্ত করিয়া দূর-দিগন্তের পানে চাহিয়া মেখলা তখন কবিতার উপাদান সংগ্রহ করিতেছিল। সে দেখিতেছিল, দূরে—বহুদূরে—নীল আব্‌ছায়ার অন্তরালে বিস্তীর্ণ আকাশ ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার দুই বাহু মেলিয়া পর্ব্বতের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিতেছে!

মায়াদেবী বলিতেছিলেন, "ওদের দু'জনের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে পুণ্ডরীক! অবশ্য বিনায়কের সহিত মেখলার পরিণয়ে যে কিছুই বাধে না সে আমি ভেবে দেখিছি, কিন্তু তবু তোমাদের কাছে একটা পরামর্শ জান্‌তে চাই!" দ্যুতি বলিল, "দেখ মা, বিনায়ক যতই ভাল ছেলে হ'ক্, তবু সে অনাথ। আমাদের মেখলাকে কি তুমি এক অনাথের হাতে তুলে দেবে মা!" পুণ্ডরীক বলিলেন, "অনাথ হ'ক্, এতে কিছু এসে যায় না—পিতামাতা সকলের চিরদিন থাকে না, কিন্তু কিছু উপার্জ্জনক্ষম হওয়া আবশ্যক।" মায়াদেবী আগ্রহের সহিত বলিলেন, "বিনায়কের আমাদের অনেক গুণ আছে। সে নানা উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম।" পুণ্ডরীক বলিল, "তা জানি মা, কিন্তু কবি ও চিত্রকরেরা বড় অলস! তারা সক্ষম হলেও উপার্জ্জন কর্‌তে চায় না!"

ঠিক্ এই সময়ে চিত্রহস্তে সহাস্যমুখে বিনায়ক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মেখলা বিনায়ককে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে তাহার কবিতার অর্দ্ধলিখিত অংশটুকু ক্রোড়াঞ্চলে গুপ্ত করিয়া সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইল। বিনায়ক মেখলার দিকে অগ্রসর হইয়া কম্পিত-হস্তে তাহার সদ্য-সমাপ্ত চিত্রখানি মেখলার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া বলিল, "এই ছবিখানি শেষ হয়ে গেছে মেখলা, তুমি নেবে?" কথাগুলি বিনায়ক বেশ সহজ সরল ও স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে পারিল না; তাহার চোখে মুখে একটা লজ্জার

রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মেখলা আজ বিনায়কের সেই ভাব দেখিয়া কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল! তাহার জননী, তাহার ভগ্নী, পুণ্ডরীক সকলেই তাহার পানে তাকাইয়া আছে দেখিয়া ছবিখানা গ্রহণ করিতে তাহার কেমন যেন একটা বাধা বোধ হইতেছিল। মায়াদেবী উভয়েরই ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। তিনি বিনায়ককে ডাকিয়া বলিলেন, "কি ছবি এঁকেছ, দেখি?" বিনায়ক সত্বর গিয়া তাঁহার সম্মুখে চিত্রখানা ধরিল। পুণ্ডরীক চিত্র দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"বাঃ বাঃ! সাধু সাধু! চমৎকার হয়েছে! সুন্দর হয়েছে বিনায়ক!" মেখলা এতক্ষণ সেইখানে—সেই ঘরের মাঝখানেই দাঁড়াইয়াছিল; ছবিখানা দেখিবার একটা বুকভরা আকাঙ্ক্ষা তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল। সহসা পুণ্ডরীকের মুখে এই উচ্চ প্রশংসাধ্বনি শুনিবামাত্র মেখলা ছুটিয়া তাহার জননীর নিকট গেল এবং তাঁহার পশ্চাৎ হইতে চিত্রখানি দেখিতে লাগিল।

দ্বারকা—শ্রীকৃষ্ণের আবাসের অন্তঃপুর-সংলগ্ন উদ্যান! উদ্যানের লতাকুঞ্জদ্বারে শ্বেতপ্রস্তরাঙ্গনে কুমারী 'ভদ্রা' বন্ধন অবস্থায় অসহায়া বসিয়াছিলেন। ভদ্রার প্রিয়তম হরিণশিশুটী তাহার মুখের পানে কাতরনয়নে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মহাবীর ফাল্গুনী তখন দ্বারকার রাজপ্রাসাদে শ্রীকৃষ্ণের অতিথি—তিনি উদ্যানভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। কোনও ক্রমে পথ ভুলিয়া অন্তঃপুর উদ্যানে আসিয়া পড়িয়াছেন এবং ভদ্রাদেবীর

ঐরূপ বন্ধনাবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহার সমীপে আসিয়া নত-জানু হইয়া ভদ্রার মৃণাল-কোমল বাহুবল্লরীর কঠিন বন্ধন সযতনে উন্মোচন করিয়া দিতেছেন! অর্জ্জুন-করস্পর্শে সুরমে সঙ্কোচে সুশীলা ভদ্রা যেন কত জড় সড় হইয়া পড়িয়াছে! তাঁহার দু'টী ইন্দীবর নয়নে কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিয়াছে! অদূরে তরু অন্তরালে শিশু মদন দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি এই অপরিচিত দীর্ঘকায় বীর্য্যবান্ পুরুষটীকে অন্তঃপুরে আসিতে দেখিয়া এবং তাহার পিসীমার হাতের বাঁধন খুলিয়া দিতে দেখিয়া যেন কত রাগিয়াছেন, ভদ্রা তাঁহাকে কিছু পূর্ব্বে খেলিবার জন্য যে 'ফুল-শর'টী গড়িয়া দিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার ছোট ধনুটীতে তাহাই যোজনা করিয়া অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিতেছেন! দূরে প্রাসাদ বাতায়ন হইতে পরিহাস-রস-রঙ্গিণী রাণী সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়া সহাস্য অধরে এই মধুর দৃশ্য দেখাইতেছেন!

চিত্রখানি বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া মায়াদেবী বলিলেন—"এ চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে বিনায়ক!" পুণ্ডরীক বলিলেন, "ভাই! এ তুমি যত্ন ক'রে রেখে দাও; আগামী বৎসর উজ্জয়িনীর বাসন্তী মেলায় পাঠিও, রাজসম্মান প্রাপ্ত হবে।" ব্যস্ত হইয়া বিনায়ক বলিল, "কিন্তু মা এখানা আমি মেখলার জন্যই এঁকেছি যে!" মেখলার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল, সে মুখটী নীচু করিয়া রহিল।—বিনায়কের চিত্র আঁকার উদ্দেশ্য স্বীকার শুনিয়া তাহার মনে মনে একটা ভারী স্ফূর্ত্তি ও গৌরব অনুভূত হইতেছিল।

মেথলা স্থির করিল এই ছবিখানি লইয়া সে তাহার চারিপার্শ্বে একটা চন্দন কাষ্ঠের বন্ধনী দিবে এবং একখানি রেশমের আবরণী বুনিয়া সে ইহা খুব যত্ন করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে।

মায়াদেবী বলিলেন, "না বিনায়ক, এত ভাল ছবি মেথলাকে দেওয়া উচিত নয়; ছেলেমানুষ নষ্ট করে ফেল্‌বে।" বিনায়ক ব্যাকুল হইয়া বলিল, "না মা! এ ছবিখানা এমন কিছুই ভাল হয়নি যে খুব যত্ন করে রাখ্‌তে হবে।" এই বলিয়া বিনায়ক চিত্রখানি গুটাইয়া মেথলার হাতে দিতে গেল—তখন দ্যুতি বলিয়া উঠিল—"ছিঃ মেথলা, ও ছবি তুমি গ্রহণ করো না; ও মূল্যবান্ ছবি যদি আমরা গ্রহণ করি, বিনায়কের ক্ষতি করা হবে।" মেথলা বড় অনিচ্ছার সহিত তাহার প্রসারিত কর সংবরণ করিয়া লইল!

বিনায়ক তাহার প্রত্যাখ্যাত চিত্রখানা মুঠা করিয়া ধরিয়া একবার সকলের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল—তাহার মনে হইল এ কক্ষের সকলে যেন আজ তাহাকে উপহাস করিতেছে! হঠাৎ তাহার সর্ব্বাঙ্গে সে যেন একটা অপমানের তীব্র জ্বালা অনুভব করিল! ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে, আত্মহারা হইয়া বিনায়ক নিমেষে তাহার চিত্রখানা দুই হাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া গৃহমধ্যস্থ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল!

"ঐ যাঃ! কি কর্‌লে!"—বলিয়া মেথলা ছুটিয়া আসিয়া অগ্নিকুণ্ডের ধারে ঝুঁকিয়া পড়িল—।

বিনায়কের কাণ্ড দেখিয়া পুণ্ডরীকও হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন —উদ্ধত যুবক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক ও উচ্চরাজসম্মান হেলায় নষ্ট করিল !—মায়াদেবী শুধু অসীম অনুকম্পার সহিত বলিলেন, "অমন সুন্দর চিত্রখানি নষ্ট করে ফেল্‌লে বিনায়ক !—" দ্যুতি ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "বিনায়কের নিজের আঁকা ছবি, ইচ্ছে কর্‌লে ও পোড়াতে পারে, ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারে ; ওরা যা খুসী তাই কর্‌তে পারে ; আমাদের সে জন্যে দুঃখ করাটা অনধিকার চর্চ্চা !"

দ্যুতির এই কঠোর বাক্য বিনায়কের পৃষ্ঠে যেন নির্ম্মমতার কশাঘাত করিল !—সে আহতের মত ধীরে ধীরে সেখান হইতে বাহির হইয়া আপনার কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়ন সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল এবং ঘন কুজ্ঝটিকাবৃত নিশিথিনীর প্রথম পাদক্ষেপের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল। তখন চারিদিকে বিপুল অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে, সবেমাত্র দুই একটী তারকা ক্ষীণ দীপিকার মত দূরে দূরে অস্পষ্ট মিট্ মিট্ করিতেছে।

বিনায়ক কতক্ষণ সেই জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মনে নাই। ঐখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে যখন ভাবিতেছে, 'দোষটা তাহারই অধিক, হঠাৎ কাজটা তাহার খুবই অন্যায় হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং সকলের নিকট তাহাকে মার্জ্জনা চাহিতে হইবে।'—সেই সময় মায়াদেবী আসিয়া তাঁহার স্বভাব কোমলকণ্ঠে ডাকিলেন, "বিনায়ক ! কিছু আহার কর্‌বে এস বাবা ! অনেক রাত হয়েছে, তোমার খাবার সময় কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে !"

বিনায়ক আহার করিতে আসিয়া দেখিল, পুণ্ডরীক ভোজনে বসিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে দ্যুতি আনত হইয়া প্রদীপটা উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে। দীপশিখার সমস্ত আলোক ছটাই যেন দ্যুতির মুখের উপর গিয়া পড়িয়াছে। আসনের উপর স্তব্ধ পুণ্ডরীকের প্রেমমুগ্ধ লুব্ধ আঁখি দুটী নির্নিমেষে সেই দীপান্বিত সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। মেখলা সেখানে নাই। যতক্ষণ বিনায়কের চিত্রখানি অগ্নিকুণ্ডে ভস্ম হইয়াছিল ততক্ষণ সে সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তারপর অভিমানিনী তার অনিরুদ্ধ অশ্রুবেগ সংবরণ করিতে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তার সমস্ত প্রাণ যখন সহস্র ব্যগ্রবাহু বিস্তার করে সেই ছবিখানি গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিল—সে ছবি তখন তার নেওয়া হয় নাই! দারুণ অভিমানে বিনায়ক তার বড় সাধের ছবিখানা আগুনে পুড়িয়ে ফেল্‌লে! মেখলা আশ্রমের একটী পরিত্যক্ত কক্ষে বসিয়া এই সব ক্রমাগত ভাবিতেছিল, আর অবিশ্রান্ত চক্ষের জল মুছিতেছিল। মেখলাকে আহারের সময় দেখিতে না পাইয়া বিনায়কের মনে হইল মেখলা নিশ্চয়ই তাহার উপর রাগ করিয়াছে! বেচারা শুষ্কমুখে নিতান্ত অপরাধীর মত আহারে বসিল ; পুণ্ডরীকের সহিত একটীও বাক্যালাপ করিতে পারিল না। দ্যুতি তাহার জননীকে ইহাদের নীরব ভোজনের সাক্ষী রাখিয়া মেখলার সন্ধানে উঠিয়া গেল।

করুণাময়ী মায়াদেবী যেদিন তাঁহার স্বর্গগত স্বামীর নিকট হইতে এই নিরাশ্রয় অনাথ ব্রাহ্মণ-বালককে সাদরে তাঁহার

অপত্যহীন ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিলেন সেইদিন হইতে এতদিন ইহাকে আপন গর্ভজাত সন্তানের মত তাঁহার নিবিড় স্নেহাঞ্চলে ঘেরিয়া অসীম যত্নে প্রতিপালন করিয়াছেন। আজ ইহার এই আঁধার-মলিন বিষণ্ণ মুখখানি দেখিয়া তাঁহার স্নেহ-প্রবণ মাতৃ-হৃদয়খানি পুত্রের ব্যথিত হৃদয়ের সহিত সমবেদনায় জননীর মতই ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

বিনায়ক আহারে বসিয়াছিল মাত্র। খাদ্যদ্রব্য কিছুই তাহার গলাধঃকরণ হইতেছিল না। মায়াদেবী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "কিছুই খেলিনে যে বিনায়ক? তখন থেকে মন খারাপ করে বসে আছিস্ কেন বাবা! ছবিখানার জন্য কি তোর বড় কষ্ট হয়েছে?" তাঁহার প্রতি বাক্যটীতে সুগভীর স্নেহ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বিনায়ক বলিল, "না মা! ছবিখানার জন্য কিচ্ছু না; অকারণ আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করিছি, এইজন্য আমার মনে বড় কষ্ট বোধ হচ্ছে। আপনারা সকলেই বোধ হয় আমার উপর কত রাগ করেছেন?" মায়াদেবী হাসিয়া বলিলেন, "দূর্ বোকা ছেলে! রাগ কর্‌বো কেন? তুই বরং আর একখানা ছবি এঁকে দিস্, মেখলাকে এবার নিতে বলে দেবো। এখন পেট ভ'রে খা' দেখি; ঐ ব্যঞ্জনগুলো মেখে নে, কিছু ফেলিস্‌নি।"

বিনায়কের আঁধার মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত ব্যঞ্জনগুলি টানিয়া লইয়া অন্নের শেষ কণাটী পর্য্যন্ত

কুড়াইয়া খাইয়া উঠিয়া গেল এবং তাহার কক্ষের দীপশিখাটী উজ্জ্বল করিয়া দিয়া শশব্যস্তে আর একখানি চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিয়া গেল।

করুণ-প্রাণ মায়াদেবী স্মিতমুখে কত কি ভাবিতে ভাবিতে কন্যাদের আহার করাইতে চলিয়া গেলেন।

আহারে বসিয়া মেখলা তাহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা! ছবিখানা সবটা পুড়ে গেছে না? বিনায়ক কি বল্লে? আমাদের ওপর খুব রাগ করেছে?" দ্যুতি গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিল, "কেন আমাদের ওপর রাগ কর্‌বে কিসের জন্য? আমরা তার কি অনিষ্ট করিছি? বরং যদি কেউ রাগ করে তবে সে মার রাগ করবার কথা; কি বল মা?" মায়াদেবী ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিন্তু দ্যুতি সে যে এরই মধ্যে মেখলার জন্য আর একখানা ছবি আঁক্‌তে বসে গেছে!" দ্যুতি অবাক্ হইয়া বলিল, "সেকি মা! কে তাকে আঁক্‌তে বল্‌লে?" মায়াদেবী তেমনই ধীর স্বরে বলিলেন, "আমি বলেছি দ্যুতি!" উৎসুক হইয়া দ্যুতি জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলেছ?" তখন হাসিতে হাসিতে মায়াদেবী বলিলেন, "বলেছি মেখলা এবার তোমার ছবি নেবে।" দ্যুতি বিস্ফারিত-নেত্রে তাহার জননীর প্রশান্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার নিজের মুখখানা যেন বিশেষ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, 'মার এ কাজটা ভাল হয়নি। এ'তে বিনায়ককে আরও প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।'

তখন মেখলা ভাবিতেছিল, 'দ্যুতি কেন এত বাধা দিচ্ছে! কই সেবার পুণ্ডরীক যখন তাকে স্বর্ণাক্ষরে লেখা "শ্রীমদ্ভাগবত" এনে দিয়েছিল আমি তো কোনও বাধা দিই নি? বরং সাধু পুণ্ডরীককে কত স্তুতিবাদ শুনিয়েছিলেম। আর আমায় আজ একজন একখানা সামান্য চিত্র দেবে, দ্যুতি কেন তাতে এত বাদ সাধ্ছে! ও কেন আমার ওপর এত নিষ্ঠুর হচ্ছে!'

বিনায়ক নিবিষ্টমনে চিত্রাঙ্কনে নিযুক্ত। তিনদিন কাটিয়া গেল, তবুও সে আঁকিতেছে। এবার আর কেহ তাহাকে বিরক্ত করিতে আসে নাই। ছবি শীঘ্র শেষ করিবার জন্য কড়া তাগাদা করে নাই। সে একান্তচিত্তে আঁকিতেছে,—

উৎসবময়ী বৈজয়ন্তী!—চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিশীথিনী!—সুরসরসী মন্দাকিনী তটে জ্যোৎস্নালোকিত অভিরাম নন্দনবন!—নন্দনবনে বিকশিত পারিজাতকুঞ্জ!—সেই সুরভিত কুঞ্জকাননে—বিকচ মন্দার তরুতলে—সুরলোকেশ্বরী ইন্দ্রাণী শচী ফুলাসনে—ফুল ভূষণে লীলায়িত ভঙ্গিমায় বসিয়া আছেন—তাঁহার সম্মুখে অনিন্দিতা রূপসী উর্ব্বশী ললিতনৃত্যকলা প্রদর্শন করিতেছেন—সুধাপানোন্মত্ত দেবরাজ তাঁহার বরবর্ণিনী অমরী প্রেয়সীর দু'টী অরুণ রাঙা চরণতলে অর্দ্ধশায়িত হইয়া স্বর্গের শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকীর বিমোহন রাগ-রঙ্গ মুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছেন!

চিত্রের প্রতি ক্ষুদ্র অংশটিতে ত্রিদিবের আলোক সৌন্দর্য্য ফুটাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তুলির পরে তুলি, বর্ণের পরে বর্ণ

মুছিয়া মাখিয়া—মাখিয়া—মুছিয়া শেষ যখন "আর না" বলিয়া বিনায়ক তুলিকা ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল অমনি একটী পরিচিত কণ্ঠের সুমধুর উচ্চহাস্যে কোমল পল্লবের মত ছোট দু'টী হাতের সুমিষ্ট করতালি ধ্বনিতে কক্ষটী পূর্ণ হইয়া উঠিল! বিনায়ক ফিরিয়া দেখিল—মেখলা! তাহার মুখে হাসি, চক্ষে বিস্ময়—বক্ষে আনন্দ! তারপর বিনায়ক যখন স্পন্দিত হৃদয়ে কত সাধ কত আশা লইয়া চিত্রখানি মেখলার প্রসারিত করে তুলিয়া দিল—মেখলা অতি দীর্ঘক্ষণ একটা অসীম কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ পুলক-চঞ্চল-কোমল-দৃষ্টি বিনায়কের মুখের পরে রাখিয়া সহসা চিত্রখানি বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কক্ষ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল—সেদিন বিনায়ক সেই প্রথম তাহার জীবন ধন্য মানিয়াছিল! তাহার চিত্র-বিদ্যা সার্থক হইল মনে করিয়াছিল!

পরদিন প্রত্যূষে মায়াদেবী যখন পূজায় বসিয়াছিলেন ও দ্যুতি রন্ধনশালায় ব্যস্ত ছিল তখন বিনায়ক মেখলাকে একটা কিছু বলিবার জন্য তাহার সন্ধান করিতে লাগিল। মেখলা তখন আপনার কক্ষে বসিয়া ক্রোড়ের উপর বিনায়কের চিত্রখানি বিছাইয়া আনতশিরে অপলক দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। সে যতই মনোযোগের সহিত সেই চিত্রখানি দেখিতেছিল ততই অধিকতররূপে মুগ্ধ হইতেছিল। মেখলা ভাবিতেছিল, 'এ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমনতর চিত্রটী আঁকিতে পারে বুঝি তেমন চিত্রকর আর কেহই নাই, এহেন সুনিপুণ বর্ণ-চাতুর্য্যে

অমরাবতীর ষড়ৈশ্বর্য্য বিকশিত করিতে পারে এমন তুলিকা বুঝি আর কাহারো নাই; চিত্রের প্রত্যেক রেখাটিতে এমন বিচিত্র ভাবের মাধুরী ফুটাইয়া তুলিতে বুঝি আর কেহই সমর্থ নয়!' এমন সময় বিনায়ক ধীরে ধীরে আসিয়া মেখলার সম্মুখে দাঁড়াইল। বিনায়ককে দেখিয়া মেখলা সচকিতে উঠিয়া ক্ষিপ্রহস্তে চিত্রখানি তাহার পশ্চাতে লুকাইয়া ধরিল। যেন এতক্ষণ সে কিছু চুরি করিতেছিল। বিনায়ক সহাস্য অধরে জিজ্ঞাসা করিল, "ছবিখানা কি তোমার পছন্দ হয়েছে মেখলা?" মেখলা চুপ করিয়া রহিল। বিনায়কের কণ্ঠস্বর আজ যেন অতিরিক্ত কোমল! বিনায়ক বলিল, "মেখলা! আজ তোমাকে একটা কথা বল্‌তে এসেছি, দেখ, আমাদের দু'জনের মধ্যে আমি একটা নূতন সম্বন্ধ সৃষ্টি কর্‌তে চাই! তোমাকে আমার সহধর্ম্মিণী হতে হবে—কি বল—হবে কি?—".

মেখলা একদিনও কল্পনা করে নাই—যে এমন একটা দিন একদিন আসিবে এবং সেদিন আসিলে তাহাকে কি উত্তর দিতে হইবে! বেচারি বড়ই মুস্কিলে পড়িল! যদিও সে বিনায়ককে ঠিক প্রণয়ী হিসাবে একদিনও ভাবে নাই, তা সত্ত্বেও তাহার মনে ইদানীং বিনায়কের জন্য নূতন করিয়া এমন একটা প্রবল আকর্ষণ আসিয়াছিল যাহা সে তরুণী বালিকা নিজেই বুঝিতে পারিতেছিল না! সহসা আজিকার এই নির্ম্মল প্রভাতে কে যেন তাহাকে এই প্রথম বুঝাইয়া দিল যে নিশ্চয় সে বিনায়ককে তাহার সমস্ত অন্তর

ভরিয়া ভালবাসিয়াছে! নতুবা এ কিসের আবেশে তার সকল প্রাণ আজ এমন পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে! এ কিসের আবেশে— উল্লাসে তার সমস্ত হৃদয়খানি আজ এমন মাতোয়ারা হইয় উঠিতেছে!

মেখলার সেই আনতসুন্দর রক্তিম মুখের পানে প্রেমবিচ্ছুরিত দৃষ্টি ফিরাইয়া বিনায়ক বলিল, "আমি বুঝ্‌তে পেরেছি তুমি কি বল্‌বে ভেবে ঠিক্ কর্‌তে পাচ্ছ না, দেখ, মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে কাল তুমি আমার কথার উত্তর দিও। কেমন?" মেখলা ভূমি পানে চাহিয়া সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। তারপর বিনায়ক অনেকক্ষণ মেখলার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল, মেখলা তখন সেই শূন্য কক্ষতলে বসিয়া পড়িয়া একাকিনী অনেক কথা ভাবিতে লাগিল।

অনেক বেলায় জননী মায়াদেবী আসিয়া ডাকিলেন, "মেখলা কি হয়েছে মা? শরীর কি অসুস্থ? আজ এখনও স্নান করলিনি—পূজা করলিনি—একাদশ দণ্ড যে অতীতপ্রায় মা!" মেখলা জননীকে দেখিয়া সত্বর উঠিয়া গিয়া তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। অকূল চিন্তাসাগরে ভাসিতে ভাসিতে সে যেন একটা কূলে আসিয়া ঠেকিল। জননীর মুখের পানে হর্ষোৎফুল্ল নয়নে চাহিয়া মেখলা একে একে তাঁহাকে বিনায়কের সকল কথাগুলি বলিল। মায়াদেবী অসীম স্নেহে কন্যার শিরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাকে কি

লেছ মা ?” মেখলা এইবার অবনত মুখে বলিল, “আমি তো কিছুই বলে উঠ্‌তে পারিনি।” মায়াদেবী কন্যার অবনত খখানি তাহার চিবুক ধরিয়া উঁচু করিয়া তুলিলেন, সহাস্য ধরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বিনায়কের হাতেই কি তোমাকে প্রদান কর্‌বো মেখলা! লক্ষ্মী মেয়েটী আমার!—তোর মনের চ্ছেটা কি আমার কাছে খুলে বল্ মা!” মেখলা তাহার সলজ্জ ফুল্ল মুখখানি জননীর বক্ষের মধ্যে লুকাইল! মায়াদেবীর কণ্ঠ রিয়া দুহিতার বাহু বেষ্টন আরও নিবিড় হইয়া উঠিল। লিকার মনের কথা আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না।

ইহারই পরদিবস পুণ্ডরীক আসিয়া মায়াদেবীকে বলিলেন, অবন্তীপুরের মহারাজ ‘অনন্ত বর্ম্মা’ একজন সভাকবির জন্য ঘোষণা করেছেন! আপনি বিনায়ককে সেখানে পাঠিয়ে দিন। নায়ক এইরূপ পদের একমাত্র যোগ্য লোক।” মায়াদেবী একটু তস্ততঃ করিয়া বলিলেন, “আর কিছুদিন যাক্, উহাদের বিবাহের র ওকে সেখানে পাঠিয়ে দেবো এখন।” পুণ্ডরীক জোর করিয়া লিলেন, “না মা, তা হতে পারে না; এমন সুযোগ খুব অল্পই াওয়া যায়। অবন্তীপুর রাজসভায় গুণের পরীক্ষা করে, কবি র্ব্বাচিত হবে। মহারাজ অনন্ত বর্ম্মা কাহারও অনুরোধ উপরোধ ন্‌বেন না; তিনি স্বয়ং বিচার করে শ্রেষ্ঠ লোক নির্ব্বাচিত র্ব্বেন। আমার বিশ্বাস, বিনায়ক সেখানে উপস্থিত হলে নিবার্য্য নির্ব্বাচিত হবে।” মায়াদেবী একটু যেন শঙ্কিতভাবে

বলিলেন, "কিন্তু পুণ্ডরীক! যদি বালক পরাজিত হয়?
পুণ্ডরীক ঘনশির সঞ্চালনে তাহার দীর্ঘ শিখা আন্দোলিত করিয়
বলিল, "তা হতেই পারে না মা! বিনায়কের শরীরে রাজকি
হবার বহু লক্ষণ বিদ্যমান আছে। এমন সুযোগ অবহেলা কর
কোনক্রমেই উচিত নয়। বিনায়ক অদ্যই অবন্তীপুর যাত্র
করুক।"

অগত্যা মায়াদেবী বিনায়ককে ডাকিয়া সমস্ত বলিলেন, শুনি
বিনায়কের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল! মেখলার নিকট হইতে দূ
যাইতে তার প্রাণ যে কিছুতেই সম্মত নয়!—বুদ্ধিমতী মায়াদে
বিনায়কের মুখভাবে একথা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, গভী
স্নেহে বিনায়কের ললাটে, চিবুকে তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইয়া দি
বলিলেন, "বৎস বিনায়ক! একটু মনস্থির করে বুঝে দেখ
তুমি এখন বয়োপ্রাপ্ত হয়েছ, "শীঘ্রই তোমাকে পত্নী গ্রহণ ক
গৃহধর্ম্মের জন্য সংসারী হতে হবে, সুতরাং তোমার স্ত্রী পুত্র
পরিবারের ভরণপোষণে সক্ষম হওয়া চাই। অতএব এ
উপার্জ্জনের কার্যে তোমার এই দণ্ডে যাওয়া কর্ত্তব্য।" বিনায়
কাতরভাবে বলিল, "মা তোমাদের ছেড়ে, তোমাদের না দে
আমি সে দূরদেশে গিয়ে কি করে থাক্‌বো?" মায়াদেবী তাহাকে
সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "কি কর্ব্বে বৎস! কর্ত্তব্যের অনুরোধে
থাক্‌তে হবেই! শুনলেম তুমি মেখলার পাণিপ্রার্থী!—
বিনায়কের সমস্ত দেহের ভিতর দিয়া একটা অধীর কম্প

বিদ্যুতের মত বহিয়া চলিয়া গেল! মায়াদেবী বলিতে লাগিলেন, "মেখলা তার স্বর্গীয় পিতার আদরে ও আমার অত্যধিক স্নেহে অকর্ম্মণ্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং তোমাকে নিরুপায় দেখেও আমি তার গর্ভধারিণী হয়ে কি করে তাকে তোমার হাতে সমর্পণ করবো। মেখলার ও তোমার বিবাহিত জীবনের সুখগুলি যে তাহ'লে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে বিবর্ণ হয়ে উঠবে!"

বিনায়ক আর দ্বিরুক্তি না করিয়া একেবারে সেইদিনই অপরাহ্ণে অবন্তীপুরে যাত্রা করিতে চাহিল। মায়াদেবী বলিলেন, "আজ কি ওদিকে যাত্রা শুভ?" বিনায়ক খড়ি পাতিয়া গণনা করিয়া বলিল, "তিন প্রহর ও আড়াই দণ্ড অতীত হ'লে কাল বেলা উত্তীর্ণ হ'বে, তখন নৈঋর্তে যাত্রা শুভ—সিদ্ধ ও সৌভাগ্য যোগ!" মায়াদেবী বলিলেন, "তবে তাই যেও; দ্যুতি ও মেখলাকে বলে দিই সব আয়োজন করে দিক্। কায়-মনো-বাক্যে আশীর্ব্বাদ করি যেন সফলকাম হও। দ্যুতির বিবাহের সময় তোমায় সংবাদ দেবো, তখন কয়েক দিনের অবসর গ্রহণ করে এখানে চলে এস।" বিনায়ক সুবোধ বালকের মত ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বিনায়কের অবন্তীপুরে যাত্রার কথা অবিলম্বে দ্যুতি ও মেখলার নিকট পৌঁছিল। এ সংবাদ মেখলার সর্ব্বাঙ্গে যেন পক্ষাঘাতের মত বাজিল! "সে কি! এত শীঘ্র! এখনও যে একটা দিবারাত্রি সম্পূর্ণ শেষ হয় নাই! এই যে সবেমাত্র তাহারা পরস্পরের নিকট

ধরা দিয়াছে! এই ত প্রথম দু'জনে দু'জনের মনোভাব জানিতে পারিয়াছে! এ যে আবার নূতন করিয়া বিনায়কের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে! আজ যে তাহার নিকট আকাশ নূতন —বাতাস নূতন—সুনন্দার কলগান নূতন—আশ্রমের বনকুসুম নূতন—বিহঙ্গের কূজন কাকলি নূতন! সকলই যে আজ তাহার চক্ষে নূতন সৌন্দর্য্যময় আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছে! সহসা তাহার সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া এ কাহার বজ্র ধ্বনিত হইয়া উঠিল!

দ্যুতি সত্বর তাহার জননীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মা! বিনায়ক এখন হঠাৎ অবন্তীতে যাচ্ছে কেন গো!" মায়াদেবী বলিলেন, "যত শীঘ্র সে উপার্জ্জন-ক্ষম হবে তত শীঘ্র সে মেখলার পাণিগ্রহণের যোগ্য হতে পার্ব্বে এই আশায়।" বিস্মিতা দ্যুতি জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি! তুমি কি তাকে এসম্বন্ধে কিছু বলেছ নাকি মা?" হাসিয়া মায়াদেবী বলিলেন, "হ্যাঁ মা, বলিছি বই কি। সে যে মেখলার পাণিপ্রার্থী হয়েছিল; মেখলাকে তার সহধর্ম্মিণী হবে কি না জিজ্ঞাসা করেছিল!" দ্যুতি অধিকতর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি মা! কবে গো? কবে জিজ্ঞাসা করেছে? কি বলেছে তাকে মেখলা?" মায়াদেবী প্রশান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "দ্যুতি! উতলা হস্‌নে মা! বিনায়ক আমার বড় সৎ ছেলে! সে মেখলাকে বলেছে 'মাকে জিজ্ঞাসা করে তবে আমার কথার উত্তর দিও'।" দ্যুতি বলিল, "তুমি তাকে নিশ্চয় খুবই উৎসাহ দিয়েছো, না মা?"

মায়াদেবী আবার হাসিয়া বলিলেন, "তা ছেলেমানুষ বিদেশে যাচ্ছে —দুটো উৎসাহের কথা না শোনালে যেতে তার মন সর্‌বে কেন মা!"

বিনায়ক তখন যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। সে আজ দূর বিদেশে চলিয়া যাইতেছে—সেখানে তাহার কি কি আবশ্যক হইবে না হইবে, মেখলা তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সেই সকল তাহাকে দেখিয়া শুনিয়া গুছাইয়া বাঁধিয়া দিতেছিল। পুণ্ডরীক যানবাহন ও শকটাদির বন্দোবস্ত করিতে বাহির হইয়াছে।

যখন বাঁধা-ছাঁদা সমস্ত শেষ হইয়া গেল, বিনায়ক মেখলার দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে চল্লেম মেখলা! অনেকদিন পরে আজ আমাকে এই চতুর্ব্বেদাশ্রম পরিত্যাগ করে যেতে হচ্ছে!" মেখলা ত্বরিত অঞ্চলে অশ্রুজল মুছিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কবে আস্‌বে?" বিনায়ক একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কি জানি! বোধ হয় অনেকদিন আর আমাদের দেখা হবে না!" বিনায়ক মেখলার চোখের পানে চাহিল; যদি সেখানে যাবার বেলা কোন আশার ভাষা পড়িয়া লইতে পারে! কিন্তু মেখলার সে বড় বড় চোখ দু'টী আবার তখন জলে ভরিয়া উঠিয়াছে! বিনায়ক সত্বর মেখলার নিকট গিয়া আপন উত্তরীয় বাসে তাহার অশ্রুপূর্ণ আঁখি দু'টী মুছাইয়া দিল, তারপর তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "এই দ্যুতির বিবাহের সময়ই আবার আস্‌বো মেখলা!" এমন সময় পুণ্ডরীকের ডাক

শোনা গেল "বিনায়ক! প্রস্তুত হয়ে এস—যানাদি সমাগত।" বিনায়ক মেখলার হাত দু'টী টানিয়া আপনার বক্ষের উপর রাখিয়া বলিল, "মেখলা! আমি জানি তোমার স্নেহের অধিকার তুমি আমায় দিয়েছ; কিন্তু তবু যাবার আগে তোমার মুখে একটা কথা শুনে যেতে চাই, তোমার প্রেমে আমায় অভিষিক্ত করে নেবে কিনা? তোমার এই শেষ কথাই সুদূর বিদেশে আমাকে সঞ্জীবিত করে রাখবে!" মেখলা নতশিরে নীরব। বিনায়ক কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়—সে বারংবার তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। তখন অশ্রুসিক্ত মেখলা সলজ্জ জড়িতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "আঃ! বিনায়ক! কেন—কেন—সেতো—তুমিতো—জানতো!—তবে—" মেখলার এই অস্ফুট স্বীকার উক্তি শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বিনায়ক নৃত্যভঙ্গীর সহিত কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল!

মেখলার হঠাৎ মনে পড়িল, বিনায়কের সঙ্গে তো আহার্য্য দেওয়া হয় নাই। পথে তো তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হইতে পারে! সে তাড়াতাড়ি কিছু আহার্য্য সংগ্রহের জন্য দ্যুতির সন্ধানে চলিয়া গেল। দ্যুতি তখন রন্ধনশালায় ছিল না, সুতরাং মেখলা আজ নিজেই অনভ্যস্ত হস্তে দেখিয়া শুনিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যখন বাহিরে আসিল তখন বিনায়ক শকটে আরোহণ করিয়াছে। মায়াদেবী, দ্যুতি ও পুণ্ডরীক আশ্রমদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। মেখলা ছুটিয়া গিয়া খাদ্যের পুলিন্দাটা বিনায়কের

হাতে তুলিয়া দিতে গেল—বিনায়ক তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি এনেছ মেখলা!" মেখলা বলিল, "খাবার!" বিনায়ক কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "খাবার! একি হবে মেখলা?" মেখলা বলিল, "পথে তোমার ক্ষুধা পাবে না?" বিনায়ক হাসিয়া বলিল, "তোমার মুখের কথা না শুন্‌তে পেলে তো আমার ক্ষুধার শান্তি হবে না মেখলা! তুমি যাবার সময় আমায় কিছু মিষ্টি কথা শোনাও, আমার সব ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়ে যাক্।" মেখলা স্মিত অবনত মুখে বলিল, "যাও!" বিনায়ক বলিল, "আচ্ছা, তবে তুমি আমায় একটু আশীর্ব্বাদ কর।" মেখলা এবার বিনায়কের মুখের পানে সপ্রেম কটাক্ষে চাহিয়া অতি মধুর কণ্ঠে বলিল, "ছি!" বিনায়কের কর্ণকুহরে কে যেন অমৃত বর্ষণ করিয়া দিল—পরিপূর্ণ আনন্দে বিহ্বল বিনায়ক গদ্‌-গদ্‌ভাবে বলিল, "তবে আমি যা বল্‌ছি তুমিও তাই বল মেখলা! এই বলিয়া বিনায়ক তাহার সুললিতকণ্ঠে কাননভূমি প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিয়া উঠিল—

"ওঁ স্বস্তি পন্থা মনু চরেম—
সূর্য্যা চন্দ্র মসাবিব।
পুনর্দ্দতাঽঘ্নতা—
জানতা সঙ্গমেমহি॥"

গদগদ্ অশ্রুনেত্রে মেখলা ও সঙ্গে সঙ্গে দ্যুতি, পুণ্ডরীক, এবং মায়াদেবীও পরস্পর কণ্ঠে কণ্ঠে মিলাইয়া সকলে একত্রে বিনায়কের সহিত ঋগ্বেদের এই স্বস্তি সূক্ত গাহিতে লাগিলেন—

"রবি শশী তারা সম, এ পথে চলিতে মম,
বাধা বিঘ্ন নাহি যেন থাকে।
সাধু ইষ্টদাতা যত, অহিংসা যাদের ব্রত,
সবারে যাঁহারা মনে রাখে।
এ পথে তাঁদের সনে, মিলি যেন হৃষ্ট মনে,
এই বর দিন সুরলোকে ॥"

*　　*　　*　　*

তিন মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। দ্যুতির সহিত পুণ্ডরীকের উদ্বাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিনায়ককে যথাসময়ে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু বিনায়ক আসে নাই। পুণ্ডরীক দ্যুতিকে চতুর্ব্বেদাশ্রম হইতে আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছেন, সুতরাং মেখলাকে এখন আশ্রমের অনেক কার্য্যই করিতে হয়। বিনায়ক আসে নাই, কোনও সংবাদও পাঠায় নাই। ক্রমে ক্রমে ছয়মাস —এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। মায়াদেবী বিনায়কের জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। একদিন মেখলাকে লইয়া তিনি পুণ্ডরীকের আশ্রমে গিয়াছিলেন, সেখানে দ্যুতি তাঁহাকে বলিয়াছে 'বোধ হয় রাজপ্রাসাদের মোহকরী বিলাস-লালসার মধ্যে বিনায়ক আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে; মেখলার কথা আর কি তাহার মনে

আছে? ভাগ্যে তাহার সহিত মেখলার বিবাহ দেওয়া হয় নাই! জগদীশ্বর রক্ষা করিয়াছেন।' দ্যুতির মুখের এই শেষ বাক্যগুলি সহ্য করা মেখলার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন—এক একটা কথা তাহার বুকের পাঁজরে গিয়া তপ্ত লৌহশলাকার মত বিঁধিয়াছিল। এক বৎসর আগে হইলে সে দ্যুতির কথার রীতিমত প্রতিবাদ করিতে পারিত, কিন্তু আজ সে এই কঠিন শাস্তি নীরবে সহ্য করিয়া রহিল। বিনায়কের বিদায়-ক্ষণের শেষ কথাগুলি স্মরণ করিয়া বালিকা অন্তরে অন্তরে সান্ত্বনা পাইত বটে, কিন্তু দ্যুতির এইরূপ দারুণ অভিযোগ জননীর মনের গভীর আশঙ্কা ও উদ্বেগ—ভাবিয়া সে মাঝে মাঝে শিহরিয়া উঠিত! তথাপি একদিনের জন্যও বিনায়কের প্রণয়ে সে সন্দিহান হইতে পারে নাই। বিনায়ক সাহসী—সে নির্ভীক—সে সত্যবাদী—ইহাই কেবল তাহার মনে হইত। সে কখনও বিনায়ককে অবিশ্বাস করিতে পারিবে না—কখন না—কখন না! সে প্রতিদিন তাহার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকিবে, —চিরজীবন থাকিবে, —যুগ-যুগান্তর থাকিবে!

আবার গ্রীষ্ম আসিল, বর্ষা চলিয়া গেল, শরৎ ও হেমন্তের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ শীতের আবির্ভাব হইল, তথাপি বিনায়কের কোনও সংবাদ আসিল না, কোনও পত্র পাওয়া গেল না। মায়াদেবী তাঁহার জামাতাকে অনেকবার অনুরোধ করিয়াছিলেন যে কোনও লোককে অবন্তীপুরে পাঠাইয়া তাহার সংবাদ লওয়া হউক, কিন্তু দ্যুতি ইহাতে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিল।

অকৃতজ্ঞ বিনায়কের নিকট এতটা হীনতা স্বীকার করিতে সে কিছুতেই সম্মতা হয় নাই।

মেখলা যেন দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে! আর তাহার মুখের সে সদা প্রফুল্লহাসি নাই। কাননবিহগীর পিককণ্ঠের সে অবিশ্রান্ত কলগান একেবারেই থামিয়া গিয়াছে! বনে বনে আর সে কুসুম চয়ন করিয়া ফেরে না। আশ্রম মৃগগুলির কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আর সে তাহাদের আদর করে না। বৃথা তাহারা কোমল গ্রীবাগুলি উন্নত করিয়া মেখলার নিকট ছুটিয়া আসে, তারপর হতাশ হইয়া শুষ্কমুখে অনাদৃত ফিরিয়া যায়। মায়াদেবী দিন দিন কন্যার অবস্থা দেখিয়া বিশেষ চিন্তিতা হইয়া উঠিলেন। অনেক ভাবিয়া শেষে তিনি তাঁহার দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সোমদেবকে ডাকাইয়া গোপনে বিনায়কের সন্ধান লইতে পাঠাইলেন।

যথাসময়ে সোমদেব অবন্তীপুর হইতে ফিরিয়া আসিল, মায়াদেবী তাহার নিকট শুনিলেন, বিনায়ক রাজপ্রাসাদে সুস্থ শরীরে পরম সমাদরে বাস করিতেছে। সে এখন অবন্তীর রাজকবি! মহারাজ অনন্ত বর্ম্মার অতীব প্রিয়পাত্র। তাহার কবিযশ-রেখা দিকে দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাহার রচিত সরস মধুর কবিতাবলী অবন্তী-পুরের জনসাধারণে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে। নিত্য সন্ধ্যায় রাজ-ধানীর প্রত্যেক প্রাসাদ-ভবন তাহারই রচিত সুখদ-সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠে। বিনায়ক সর্ব্বলোকপ্রিয় ও প্রভূত অর্থবান্ হইয়াছে। সোমদেব নাকি আরও শুনিয়াছে যে মহারাজ তাঁহার একমাত্র

দুহিতা 'কুমারী মঞ্জুবাদিনী'কে বিনায়কের হস্তে সমর্পণ করিবেন স্থির করিয়াছেন। বিদুষী রাজনন্দিনী নাকি এই সুকণ্ঠ-চারুমূর্ত্তি-নবীন-কবির বড় অনুরাগিণী হইয়াছেন!

মায়াদেবী এই সংবাদ পাইয়া বড়ই হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ব্যথিতা কন্যাটীর জন্য তাঁহার অন্তরটী আজ বড়ই কাতর ও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সেই দিন হইতে বিনায়ককে ভুলিবার জন্য কন্যাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। 'দরিদ্র বলিয়া—অনাথ বলিয়া—আমরা যাহাকে বিদায় দিয়াছি; সে আজ আপন প্রতিভা-বলে যশস্বী ও অর্থশালী হইয়াছে! সে কেন আর—আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে? তাহার কথা ভুলিবার চেষ্টা কর্ মেখলা!' কন্যার প্রতি মায়াদেবী সজলনেত্রে যখন এইরূপ উপদেশ দিতেন, তাঁহার পুত্রতুল্য স্নেহের বিনায়ককেও যখন ভুলিয়া যাইতে বলিতেন—দুঃখিনীর রুদ্ধকণ্ঠ ঠেলিয়া মর্ম্মন্তুদ বেদনা, অনুতাপ ও অভিমান কাঁদিয়া বাহির হইতে চাহিত! তিনি আর অধিক কিছুই বলিতে পারিতেন না। শুধু এই বলিয়াই তিনি নীরব হইতেন। মেখলা কিন্তু একথা কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহিত না, সে বার বার তাহার জননীকে বলিত, "না মা! বিনায়কের সেরূপ প্রকৃতি নহে।"

ক্রমে দ্যুতিও এ সংবাদ শুনিল। তখন ভগ্নীর জন্য তাহারও অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া সে তাহার এই অসহায়া কনিষ্ঠা সহোদরাটীকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ধর্ম্ম উপদেশ পাইয়া অনেকেই শোকে দুঃখে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু মেখলা তাহা পারিল না। ধনী অবস্থা বিপর্য্যয়ে দীন হইয়া পড়িলে হয়ত একদিন ধর্ম্ম উপদেশে সে সান্ত্বনালাভ করিতে পারে, কিন্তু যে তাহার প্রাণাধিক প্রেমাস্পদকে হারাইতে বসিয়াছে—ধর্ম্ম উপদেশ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারে না। নির্জ্জনে পরমাত্মার ধ্যানে মনঃসংযোগ করিতে বসিলে তাহার প্রণয়াহত অন্তর-পটে তাহার সেই অতি পরাণপ্রিয় দীপ্ত মূর্ত্তিটী ভাসিয়া উঠে!

দ্যুতি যখন কিছুতেই মেখলাকে শান্ত করিতে পারিল না, বরং দিন দিন তাহাকে বিনায়কের জন্য ভাবিয়া শীর্ণা ও মলিনা হইয়া পড়িতে দেখিল, সে তখন মেখলার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইল। মেখলা সেদিন হইতে আর তাহার ভগিনীর মুখে একটীও সান্ত্বনার বাণী শুনিতে পাইল না। অভাগিনী তাহার প্রণয়-নিরাশ ব্যর্থ-জীবন সুনন্দার স্বচ্ছ শীতল অতল ক্রোড়ে অনেকবার বিসর্জ্জন দিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু তাহার এই অতি মমতাময়ী জননীর মুখের পানে চাহিয়া সে তাহা পারে নাই।

আজ কয়েক দিন হইল মেখলা বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। একবারও শয্যা হইতে উঠে নাই। মায়াদেবী কন্যার নিকট বসিয়া তাহার মাথার রুক্ষ কেশগুলির মধ্যে অতি সযতনে তাঁহার সেবাপরায়ণ স্নেহ-কর সঞ্চালন করিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "বিনায়কের কথা আর ভাবিস্‌নে মা! সকলেই বল্‌ছে সে আর

ফিরে আস্‌বে না!" মেখলা ক্ষীণস্বরে বলিল, "সত্যই কি আর আস্‌বে না মা?" অভাগিনীর চোখ দু'টী জলে ভরিয়া উঠিল! মায়াদেবী সস্নেহে আপন অঞ্চলে কন্যার আঁখিজল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "ছিঃ! মেখলা! চুপ কর্ মা! আর কাঁদিস্‌নে, আর আমায় কাঁদাস্‌নে!" মেখলা মাথার উপর দিয়া তাহার শীর্ণ হাত দু'টী তুলিয়া দিয়া মাতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, "হ্যাঁ মা! বিনায়ককে ভালবাসা কি আমার অন্যায় হয়েছিল?" মায়াদেবী স্নেহভরে কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "না মা! তোমার কিচ্ছু অন্যায় হয়নি!" মেখলা তখন করুণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মাগো! তবে কেন তোমরা তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দিলে বল না!"

এমন সময় তাঁহাদের বাটীতে একজন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মায়াদেবী সত্বর অতিথির অভ্যর্থনার জন্য উঠিয়া গেলেন। অতিথি অবন্তীপুর হইতে আসিয়াছেন। তিনি মায়াদেবীর নামে একখানি পত্র আনিয়াছেন। কম্পিতহস্তে পত্র খুলিয়া মায়াদেবী পড়িলেন—বিনায়ক লিখিয়াছে—"মা! পত্নী ও পুত্র পরিজনের ভরণপোষণের জন্য এতদিন পরে আমার যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। আমি শীঘ্রই আপনার চরণ দর্শন করিতে চতুর্ব্বেদাশ্রমে ফিরিয়া যাইব। আপনার আশীর্ব্বাদে আশা করি এবার আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। ইতি।"

এই মাত্র! খুব সামান্য ক্ষুদ্র পত্র! এ পত্রে মেখলার নামগন্ধও

নাই! কিন্তু ইহাতেই মায়াদেবীর সকল দুশ্চিন্তা দূর হইয়া গেল। তবে পত্র পড়িয়া তিনি একটু ক্ষুব্ধ হইলেন। বিনায়ক তাহাদের উপর অভিমান করিয়াছিল, তাই সে এতদিন তাঁহাদের কোনও সংবাদ দেয় নাই! এই পত্রের কতিপয় ছত্র হইতে তিনি ইহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। তা হউক, কিন্তু মেখলাকে যে সে ভোলে নাই ইহাই যথেষ্ট। অবন্তীপুর রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য্যময়ী বিলাস লালসার দুর্ব্বার প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া সে যে মেখলার জন্যই আবার চতুর্ব্বেদাশ্রমে ফিরিয়া আসিতেছে, ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। দীন—অনাথ বিনায়ক আজ ধনী হইয়া—বিশ্বের পরিচিত হইয়া যশমণ্ডিত শিরে তাহার প্রণয়িনীর ব্যগ্র বক্ষে ফিরিয়া আসিতেছে—মায়াদেবীর অন্তর মহানন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল!

দুই দণ্ড পরে পত্রখানি বামহস্তে আপন অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া লইয়া মায়াদেবী পীড়িতা কন্যার শয্যাপ্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

"মেখলা! এখন কেমন আছিস্ মা?"

"ভাল আছি।"

"একবার উঠে বস্‌তে পার্ব্বিনে?"

"হ্যাঁ মা, পার্ব্ব।"

মেখলা উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, মায়াদেবী কন্যাকে দুই হাতে ধরিয়া সাবধানে বসাইয়া দিতে গেলেন, সেই সময় পত্রখানি তাঁহার অঞ্চল হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেল। মায়াদেবী ক্ষিপ্রহস্তে

তৎক্ষণাৎ তাহা কুড়াইয়া লইলেন, কিন্তু মেখলা তৎপূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি মা ?"

"এ একখানা পত্র। আমাদের আশ্রমে আজ একজন অতিথি এসেছে জানিস্ মেখলা ?"

"হ্যাঁ মা।"

"কোথা থেকে এসেছে বল্ দেখি ?"

"কি জানি মা !"

কথাটা বলিয়াই হঠাৎ মেখলা তাহার জননীর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "মা !"

"কি মা বল !"

"সেখান থেকে বুঝি ?"

"হ্যাঁ মা। অবন্তীপুর থেকে তিনি এই পত্র এনেছেন।"

এই কথা বলিয়া মায়াদেবী যেমন পত্রখানা বাহির করিয়াছেন, বাজপক্ষীর মত মেখলা তাঁহার হাত হইতে পত্রখানা ছিনাইয়া লইয়া এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল।

আজ অনেকদিন পরে অভাগিনীর বিষাদাচ্ছন্ন আঁধার মুখে আবার স্নিগ্ধ হাসি দেখা গেল ; চিন্তা-কাতর বিবর্ণ গণ্ডদ্বয় আনন্দে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ! হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—

"বিনায়ক ফিরে আস্‌বে লিখেছে না মা ?"

"হ্যাঁ মেখলা।"

"দেখ মা! দ্যুতিকে এখন একথা বোল না। সে এলে তারপর দ্যুতিকে খবর দেবো কেমন?"

"আচ্ছা তাই হবে।"

"দ্যুতি কিন্তু ভারী আশ্চর্য্য হয়ে যাবে, না মা? সে বড় জোর করে বলেছিল যে বিনায়ক আর ফিরে আস্‌বে না!"

"ঠিক বলেছিস্ মেখলা! দ্যুতি শুনে ভারী আশ্চর্য্য হবে।"

"আমি কিন্তু মা তোমাদের বরাবর বলিছিলুম যে সে নিশ্চয় ফিরে আস্‌বে। কেমন বলিনি মা?"

"হ্যাঁ মা, বলিছিলি। তুই যে আমার অন্তর্যামী মেয়ে!" তারপর মাতা ও কন্যা আনন্দে বিহ্বল হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন।

অতিথি চলিয়া যাইবার পর একমাস অতীত হইয়াছে। মেখলা ইহারই মধ্যে বেশ সারিয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বের মত আবার সে আশ্রম মৃগগুলির যত্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কটিতে বসন বাঁধিয়া কুটীর প্রাঙ্গণের তরু আলবালে জলসেক করিতে লাগিয়া গিয়াছে। চতুর্ব্বেদাশ্রমের নয়নাভিরাম স্নিগ্ধ-বনশ্রী যাহা এতদিন অযতনে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছিল, মেখলার প্রাণপণ যত্নে আবার তাহারা সচেতন হইয়া পূর্ব্বগৌরবে ফিরিয়া আসিতেছে। চারি-পার্শ্বের কুসুম-তরুরাজি আবার ফুলভারে অবনত হইয়া পড়িতে

লাগিল। শুষ্কপ্রায় মালতীর বিস্তৃত লতাজাল আবার মুঞ্জরিত হইয়া কলি ও কুসুমে হাসিতে লাগিল।

একদা এই নববসন্তের সমুজ্জ্বল অপরাহ্ণে মায়াদেবী বড় যত্ন করিয়া কন্যার কবরী রচনা করিয়া দিতেছিলেন, এমন সময় আশ্রমের বহিঃপ্রাঙ্গণ হইতে অতি পরিচিত কণ্ঠে কে ডাকিল, “মা!” মায়াদেবী তাড়াতাড়ি কন্যার অর্দ্ধসমাপ্ত কবরী ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—মেখলা ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটিয়া নদীকূলে পলাইয়া গেল।

বিনায়ক গৃহে প্রবেশ করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া মায়াদেবীর চরণধূলি সাষ্টাঙ্গে গ্রহণ করিল। মায়াদেবী পুলকাশ্রুসিক্তনেত্রে বিনায়কের মস্তকঘ্রাণ করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং যথাবিহিত কুশল প্রশ্নাদির পর বিনায়কের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া মেখলা যে নদীতীরে পলাইয়াছে, এ সংবাদটীও তাহার নিকট গোপন করিলেন না। বিনায়ক তৎক্ষণাৎ মেখলার সন্ধানে সুনন্দার তীরে ছুটিল।

নদীতটের ঘন পুন্নাগ শ্রেণীর অন্তরালে দাঁড়াইয়া মেখলা গোপনে আশ্রম কুটীরের পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। অনেকদিন দেখে নাই; যদি একবার সেই দেবতার মত মুখখানি দেখিতে পায়! বিনায়ক অতি সন্তর্পণে পশ্চাৎ হইতে পা টিপিয়া গিয়া দুই হাতে মেখলার উৎসুক আঁখি দু’টী চাপিয়া ধরিল। এ মোহন করস্পর্শ যে কাহার মেখলার বিকম্পিত সর্ব্বাঙ্গ তাহা

নিমেষেই বুঝিতে পারিল! বালিকার সেই বেপথু রোমাঞ্চিত তনুখানি বিনায়ক তাহার বিশাল অঙ্গের 'পরে তুলিয়া লইল। সুহাসিনীর স্মিতাধরে আর দুইটী সহাস্য অধর সন্নিবিষ্ট হইল!

তখন জোনাকী জ্বলিয়া উঠিয়াছে, মলয় বাতাস কুসুমসুবাস অপহরণ করিয়া লুকোচুরি খেলিতেছে! নীড়প্রত্যাগত দোয়েল ও পাপিয়ার সুধা কণ্ঠের কলকাকলী তখনও মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে!

দীক্ষা

১

গোধূলির ম্লান আলো কানন-বীথির চারিপার্শ্বে ঘনাইয়া উঠিতেছে। গীতমুখরা বুল্‌বুলেরা কেহই আর গুন্ গুন্ করিতে করিতে শাখায় শাখায় ছুটাছুটি করিতেছে না। সেদিনের মত বন-বিহগীদের খেলা সাঙ্গ হইয়াছে। কেবল দূরে দূরে ক্বচিৎ এক আধবার পথহারা পাখীগুলিকে নীড়ে ফিরাইবার জন্য কোনও কোনও বিহগবধূর করুণ আহ্বান শুনা যাইতেছে।

বনস্পতি জম্বুতরুতলে শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেব পদ্মাসনে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। সে স্থির অটল মূর্ত্তির চারিদিকে একটা স্তব্ধ নীরবতা বিরাজ করিতেছে। একটা স্নিগ্ধ শান্তিতে সমস্ত বনস্থলী যেন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে!

সহসা বহুদূর হইতে একটা গম্ভীর ধ্বনি ভাসিয়া আসিল, ক্রমে অশ্বপদধ্বনি শোনা গেল; তা'রপর বহুমূল্য পরিচ্ছদে বিভূষিত-দেহ এক রাজকুমার রক্ষিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন।

রক্ষীদের অপেক্ষা করিতে বলিয়া কুমার একাকী ভগবানের সমীপে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া

ভক্তি-গদ-গদ-কণ্ঠে কহিলেন, "হে প্রভু! হে আমার জীবন-দেবতা! আমি বহুদূর হইতে আপনার শ্রীচরণ-দর্শন-মানসে এখানে আসিয়াছি। আমি 'কাঞ্চনার' রাজপুত্র, আমার নাম 'জেত'। বুদ্ধশ্রমণ দেবগুপ্ত যে দিন আমাকে আপনার পুণ্য-কাহিনী শুনাইয়াছেন, প্রভু! সে দিন হইতে আর আমার মনের শান্তি নাই। আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। প্রাসাদের ধনরত্ন আর আমায় প্রলুব্ধ করিতে পারে না। আমার স্ত্রী ও বন্ধুবর্গ আর আমার হৃদয়ে আনন্দ-ধারা বর্ষণ করিতে পারে না। আপনার দাসত্ব লাভ করিতে না পারিলে আমার চিত্ত শান্ত হইবে না। হে প্রভু! আমায় দীক্ষিত করুন! আপনার চরণ-সেবার অধিকারী করুন!"

ভগবান্ 'সত্যবাক্যে'র শ্রীমুখ হইতে কোনও বাক্য শোনা যায় নাই, কেবল তাঁহার দু'টী পদ্মপলাশনেত্র হইতে অসীম স্নেহ-দৃষ্টি বিকীর্ণ হইয়া কুমারের সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিতেছিল।

অধীর কুমার বলিতে লাগিলেন, "দয়া করুন, প্রভু! দয়া করুন! আশৈশব আমি অকলঙ্ক জীবন যাপন করিয়াছি; ধর্ম্ম ও শাসন-পদ্ধতি মানিয়া চলিয়াছি। সদ্‌গ্রন্থ-পাঠে সময় অতিবাহিত করিয়াছি, কখনও কাহারও অনিষ্ট করি নাই,—ইহাতেও কি আমি আপনার দীক্ষা-লাভের যোগ্য হই নাই!"

ভগবান্ অমিতাভ শুধু ধীরস্বরে বলিলেন, "না।"

কাতরকণ্ঠে যুবরাজ বলিতে লাগিলেন, "তবে আদেশ কর,

হে দেবতা! আমি কিসে তোমার চরণসেবার যোগ্য হইতে পারিব, আমায় আদেশ কর।"

ভগবান্ সুগত বলিলেন, "বৎস! যত্ন কর, অবশ্য সফলকাম হইবে।"

তখন কুমার প্রভুর পাদবন্দনা করিয়া কহিলেন, "বুঝিয়াছি প্রভু! তুমি আমায় পরীক্ষা করিবে। তবে তাহাই হউক দয়াময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। তবে আবার কবে শ্রীচরণ সন্দর্শনে উপস্থিত হইব অনুমতি করুন।"

জলদ-মন্দ্রে শ্রীভগবান্ আদেশ করিলেন, "সপ্ত শরতের চন্দ্র অবসানে এখানে পুনরায় আসিও।"

কুমার প্রভুকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রভু গৌতম-বুদ্ধ নিমীলিত নেত্রে পুনর্ব্বার ধ্যানস্থ হইলেন।

২

সপ্ত শরতের চন্দ্র উঠিয়া আবার অস্ত গিয়াছে। আজিও সেই জম্বু-তরুতলে ভগবান্ বুদ্ধদেব তেমনই ধ্যান-মগ্ন।

রক্তনদীর ভিতর শ্রান্ত সূর্য্য ডুবিয়াছে! ঘনকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ আকাশের ক্রোড়ে মহা ঝঞ্ঝার বার্ত্তা লইয়া সমবেত হইতেছে। প্রখর শীতল পবন প্রবল স্বননে ছুটিতেছে। সমস্ত অরণ্য ও

অরণ্যবাসীর অন্তর ঘেরিয়া একটা মহা উদ্বেগের ছায়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

ক্ষণপরেই ভীমবেগে কানন-তরুশিরে ভীষণ ঝড় আসিয়া পড়িল। শতস্রোতে প্রবল বারিধারা নামিল। সমস্ত অরণ্যানী যেন কাঁপিতে লাগিল। কেবল জম্বু-তরুপত্র একটী ধারাও স্পর্শ করিল না। মত্ত বায়ুর সহিত বুদ্ধ-দেহের উপর একটী বারিকণাও ভুলিয়া আসিয়া পড়িল না।

সেই তীব্র ঝঞ্ঝায়, নিবিড় সন্ধ্যায়, আঁধার বনপথে যুবরাজ জেত রক্ষিবর্গের সহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রক্ষিগণকে দূরে রাখিয়া কুমার প্রভুর সমীপস্থ হইলেন এবং মণিময় মুকুট উন্মোচন করিয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে শির লুটাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! এবার কি আমার দীক্ষা-লাভ হইবে? আমি কি দেব-সেবার যোগ্য হইয়াছি?"

ভগবান্ অমিতাভ শুধু ধীরস্বরে বলিলেন, "না।"

শুনিয়া কুমারের আঁখি-দু'টী অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। তিনি উত্তরীয় বাসে চক্ষু আবৃত করিলেন। বহুক্ষণ তাঁহার মুখে একটীও বাক্য সরিল না। তা'রপর ধীর-কম্পিত-স্বরে কহিলেন, "প্রভু গো! হে দেবতা! কি দোষে দাসকে পায়ে ঠেলিতেছ? আমি যে বড় উৎকণ্ঠায় এই দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছি। কত পবিত্রভাবে এই দিনগুলি অতিবাহিত করিয়াছি। কত সৎকাজ— কত দান ধ্যান করিয়াছি। সর্ব্ব সুখ সাধ বর্জ্জন করিয়াছি।

ইন্দ্রিয় ভোগবাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছি। প্রাসাদের নির্জ্জনতম কক্ষে একাকী দেবতার ধ্যানে নিযুক্ত ছিলাম। প্রভু! তথাপি কেন তুমি আমায় গ্রহণ করিতেছ না? তবে কি আমার সাধনা ব্যর্থ হইয়াছে! আমার তপ নিষ্ফল হইয়াছে! আমি কি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়াছি?”

প্রভু কহিলেন, “বৎস! আমি ত তোমাকে পার্থিব সুখ-সাধে জলাঞ্জলি দিতে উপদেশ দিই নাই; সর্ব্বত্যাগী যোগীর জীবন যাপন করিতে বলি নাই। যাও কুমার! তোমার ভবনে ফিরিয়া যাও। তুমি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়াছ।”

তখন বজ্রধ্বনি নীরব হইয়াছে। ধারাবর্ষণ ক্ষান্ত হইয়াছে। পবন-বেগ শান্ত হইয়াছে। কানন-তরুরাজি স্থির হইয়াছে।

কুমার ‘জেতের’ নয়নে তখনও অশ্রু ঝরিতেছে। কুমার কাতরকণ্ঠে নিবেদন করিলেন, “প্রভু! যদি কৃপা ক’রেছ, তবে বলিয়া দাও—কোথায় কিরূপে আমায় পাপ স্পর্শ করিয়াছে; আমি প্রায়শ্চিত্তের অভিলাষী।”

প্রভু গৌতম বলিলেন, “যুবরাজ! তোমার স্মরণ আছে কি—একদা রাজসভা-মধ্যে তোমার পিতার সম্মুখে তোমার অজ্ঞাত কোন মিথ্যা অপরাধে তুমি অভিযুক্ত হইয়াছিলে? সে দিন সে সভাতলে তুমি প্রাণপণে তোমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলে; আপন নির্দ্দোষতার সহস্র প্রমাণ প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার নীরব থাকাই উচিত ছিল; কারণ

সত্য কখনই গোপন থাকে না। সে দিনের সে অপরাধ তোমার জন্মান্তরের কৃত অপরাধের শাস্তি বলিয়া অথবা গতজীবনের অনুষ্ঠিত ঋণ পরিশোধ করিতেছ মনে করিয়া নির্ব্বিবাদে মাথায় তুলিয়া লওয়া উচিত ছিল। সে দিন সেই প্রথম পরীক্ষায় তুমি অকৃতকার্য্য হইয়াছ।”

বিস্মিত কুমার কহিলেন, “সে কি প্রভু! সত্য যদি দোষী হইতাম, তবে সকল অপরাধ নতশিরে বহন করিতাম; কিন্তু সে দিনের সে অভিযোগে আমি যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ! মিথ্যা অপবাদ কিরূপে নীরবে সহ্য করিব প্রভু?”

প্রভু স্বগত বলিলেন, “যাঁহারা আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রচার করেন, যাঁহারা সত্যবাদী বলিয়া শ্লাঘা করেন, তাঁহারাই কেবল আপনাদের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিবার অধিকারী; কিন্তু যে জন এ পথে আসিবে, ‘ভিক্ষু’ হইবে, সকল ঘোর অপবাদ সে নীরবে সহ্য করিবে, গৌরব ও তাচ্ছিল্য সে তুল্য মানিয়া লইবে।”

কুমার ‘জেত’ অবনত মুখে ভূমি-নিবদ্ধ-দৃষ্টি ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

প্রভু মারজিৎ কহিতে লাগিলেন, “শোন বৎস! দ্বিতীয়বার তোমার কোথায় ত্রুটী হইয়াছে। যুবক ‘সুযশ’ তোমার সুহৃৎ। তাহার সহিত তোমার বিশেষ প্রণয় ছিল। একদা তোমার পিতার সভায় একজন আগন্তুক আসিয়াছিল, তাহার নাম ‘বল্লিক’। সুযশের চিত্তে আসন পাইতে তাহার প্রাণপণ যত্ন ছিল। সে

তোমার ও সুযশের মধ্যে একটা ব্যবধান আনিবার চেষ্টা পাইয়াছিল। সুযশের অন্তরে যে শ্রেষ্ঠ স্থানটুকু তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, সে তাহা অধিকার করিতে চাহিয়াছিল; তাহাতে তোমার প্রাণে সে দিন বড় ব্যথা বাজিয়াছিল! তোমার অন্তর সে দিন তাহার সহিত বিরোধ বাধাইতে চাহিয়াছিল। নবাগতের উদ্দেশ্যসাধনে তুমি একান্ত যত্নে বাধা দিয়াছিলে। কিন্তু তোমার উচিত ছিল, সে দিন নির্ব্বিকার থাকা! তোমার মনের গুপ্ত কোণে বল্লিকের প্রতি যে বিরুদ্ধভাব জাগিয়াছিল, তাহা পদতলে দলিয়া রাখা! সুযশকে তুমি নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে পার নাই। সুযশের স্নেহে ও সৌহার্দ্দ্যে তুমি আপনি একা সুখী হইতে চাহিয়াছিলে!”

কুমার কহিলেন, “প্রভু! তবে অবধান করুন, সে নবাগত বল্লিক নিজের কোনও একটা স্বার্থসিদ্ধির আশায় অতি অল্প দিনের জন্য সুযশের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিল। আমি তা'র অতি হীন এই দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া সুযশকে বারংবার সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম। সেরূপ করা কি আমার উচিত হয় নাই?”

শ্রীভগবান্ স্নিগ্ধকণ্ঠে উত্তর করিলেন, “কে জানিত বৎস! কপট প্রণয় একদা নির্ম্মল হইয়া পরিশুদ্ধ প্রণয়ে পরিণত হইতে পারিত কি না? কিন্তু সে যাহা হউক, রাজকুমার! ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাত যাঁহারা, তাঁহারাই কেবল তাঁহাদের সুহৃদ্বর্গকে কপট

প্রণয়ীদের নিকট হইতে দূরে রাখিবেন; কিন্তু যে জন এ পথে আসিবে, "ভিক্ষুব্রত" অবলম্বন করিবে, সে অন্তরের প্রিয়তম প্রণয়ীকেও পরিহার করিবে, এবং হৃদয় হইতে সকল প্রকার হিংসা ও কুচক্রতা সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিবে; একান্ত অনুগত বন্ধুর বিশ্বাস-ঘাতকতাও সে নির্ব্বিকারচিত্তে সহ্য করিবে। মহৎ যুবক! তুমি তোমার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য ও রাজ্যলোভে বীতস্পৃহ হইয়াছ বটে, সকল প্রকার পার্থিব সুখ পরিহার করিয়াছ বটে; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়-জয়ে সমর্থ হও নাই। প্রকৃত ত্যাগের নিকট তুমি পরাজিত হইয়াছ। বাসনা-বিরহিত প্রেম ও স্বার্থত্যাগের রক্তাম্বরে তুমি ভূষিত হইতে পার নাই।"

প্রভুর শ্রীমুখের মধুর উপদেশবাণী শুনিতে শুনিতে নৃপতনয় জেত মুগ্ধ হইয়া গেলেন। উন্মত্তের মত বলিলেন, "বল, বল, হে দেবতা! আরও কত পদস্খলন হইয়াছে, বলিয়া দাও। রাত্রি গভীর হইয়াছে বটে, কিন্তু রজনীর এ অন্ধকার আমার পাপভার ঢাকিতে পারিবে না।"

প্রভু সিদ্ধবাক্ কহিলেন, "শুন বৎস! তৃতীয়বার তুমি প্রেমের নিকট অপরাধী হইয়াছ। তোমার ধর্ম্মপত্নী "নন্দা" একদিন কোনও গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী বলিয়া অভিযুক্তা হইয়াছিল। তাহার সেই অপরাধের জন্য তুমি তাহাকে তোমার প্রাসাদ হইতে দূরীভূত করিয়াছ। তাহার তরুণ বয়স ও সংসারানভিজ্ঞতার বিষয় ভাবিয়া তাহার প্রতি একটুও দয়া কর নাই।"

কুমার মিনতি করিয়া বলিলেন, "হে ভগবন্! আমি যাহা করিয়াছি, তদ্ভিন্ন আর কি উপায় ছিল? এক দুর্ব্বল-চিত্তা নারীকে পার্শ্বে রাখার অপেক্ষা আমার বংশের মর্য্যাদা ও রাজ্যের সম্মান রক্ষা করা কি আমার কর্ত্তব্য নয়? নন্দাকে গৃহে রাখিলে কি কুনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া হইত না? পবিত্রতার অবমাননা করা হইত না?"

শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেব বলিলেন, "বৎস! তোমাকে কি আবার বলিতে হইবে যে, ধার্ম্মিক নামে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরাই পাপপুণ্য ও সদসতের বিচার করিবে, দোষীকে শাস্তি দিবে, অন্যায়কে বহিষ্কৃত করিবে। কিন্তু যে ভিক্ষু, তাহার বিচার করিবার অধিকার কোথা? সে কেবল অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পারে। সে দোষীকে খুঁজিবে না, সে দোষের হেতু কে সন্ধান করিয়া নিবারণ করিবে। তাহার অন্তরে কঠোরতার লেশমাত্রও থাকিবে না। তাহার হৃদয়ে সাগর-প্রমাণ দয়া ও কোমলতা থাকা চাই।

"শুদ্ধমাত্র শুষ্ক পবিত্রতা কোন ধর্ম্মেরই অঙ্গ নয়—তাহা কেবল অধর্ম্ম হইতে দূরে থাকা মাত্র। সর্ব্ব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার প্রয়াস, মুক্তির পথে নিয়ত একটা বিষম বাধার সৃষ্টি করিতে থাকে। অযাচিত করুণা ও নিঃস্বার্থ প্রেমে অভিষিক্ত হইতে না পারিলে কেবলমাত্র পবিত্রতা হৃদয়কে গর্ব্বিত ও কঠিন করিয়া তুলে।"

প্রভু গৌতমবুদ্ধের মুখারবিন্দ-নিঃসৃত সুমধুর উপদেশামৃত পান

করিতে করিতে কুমার জেতের নয়নযুগল হইতে অবিরল আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। যুবরাজ ভূলুণ্ঠিত হইয়া বারংবার প্রভুর চরণপদ্মে প্রণত হইলেন ও স্বীয় ওষ্ঠের দ্বারা প্রভুর পাদ-নখ-কোণ স্পর্শ করিলেন ; পরে যুক্তকরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "হে ভগবন্! হে তথাগত সর্ব্বজ্ঞদেব! যদি এ দাসের প্রতি এত করুণা ক'রেছ, দয়াময়! তবে আর একবার আমাকে সময় দাও, প্রভু! আজ আমায় একেবারে পরিত্যাগ ক'রো না!"

প্রভু সিদ্ধার্থ "তথাস্তু" বলিয়া ধ্যানস্থ হইলেন।

যুবরাজের রক্ষিবৃন্দ প্রজ্বলিত মশাল হস্তে আগে আগে চলিল। সকলের পশ্চাতে অবনত-শিরে অতি ধীরপদে যুবরাজ অরণ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

৩

রাজ্যে ফিরিবামাত্র যুবরাজ শুনিলেন যে, বৃদ্ধ নরপতি সহসা দেহত্যাগ করিয়াছেন। পিতার মৃত্যুতে অগত্যা যুবরাজকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইল। অতি অল্পদিনেই নবীন ভূপালের যশোরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এমন ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্ম্ম-পরায়ণ, সুশাসক রাজ্যেশ্বর বুঝি আর কোন দেশে নাই।

মহারাজ জেত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তাঁহার বন্ধু সুযশ এবং সেই নবাগত বল্লিককে উচ্চ রাজ-সম্মানে ভূষিত করিলেন

এবং তাহাদের উভয়কে পরস্পর-সন্নিহিত দুইখানি সুবৃহৎ সুন্দর অট্টালিকা বসবাসের জন্য উপহার দিলেন। এই যুবকদ্বয় লোকপ্রিয় ছিল; সুতরাং মহারাজের এই উদারতায় শত্রু মিত্র সকলেই সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু যে দিন মহারাজ তাঁহার বিতাড়িত পত্নী নন্দার বহু অনুসন্ধান করিয়া হতভাগিনীকে প্রাসাদে পুনরানয়ন করিলেন, তখন নবীন নৃপের এ কার্য্যটী কেহই সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিল না। তাঁহার অমাত্য ও সভাসদেরা ইহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিল; কিন্তু মহারাজ জেত তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। রাজ্যের গণ্য, মান্য, সম্ভ্রান্ত প্রজাদের এ সম্বন্ধে আপত্তি-সূচক আবেদন বার বার নিষ্ফল হইল। তখন সকলেই ক্রুদ্ধ হইলেন। ভূপতির প্রতি সকলেরই একটা আক্রোশ হইল। সকলে মিলিত হইয়া রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। মহারাজকে হত্যা করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনে বসাইবার আয়োজন চলিতে লাগিল। বিদ্রোহীরা রাজ্যময় রটাইয়া দিল যে, 'মহারাজ জেত আর শাসনকার্য্যে সমর্থ ন'ন। একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর কবলে পড়িয়া তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে। তিনি যদি আর অধিক দিন রাজদণ্ড ধারণ করেন, তবে কাঞ্চনাদেশ ছারখার হইয়া যাইবে। অনাদি কাল হইতে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের স্থাপিত যে ধর্ম্মনিয়ম প্রচলিত আছে, তিনি তাহার পরিবর্ত্তে এক ছাই ভস্ম নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। যে দেশের রাজা ধর্ম্মদ্রোহী হয়, সে দেশের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।'

এই কথা শুনিয়া জনসাধারণে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। অধিকাংশ প্রজা ধর্ম্মনাশের ভয়ে ভীত হইয়া ধর্ম্মদ্রোহী রাজার মৃত্যুকামনা করিতে লাগিল। কেবলমাত্র কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর ও তাঁহার দেহরক্ষিগণ ব্যতীত অপর সকলেই মহারাজ জেতের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

একদা মহারাজ সভাগৃহে বসিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, সহসা বহির্দ্দেশ হইতে একজন ভীমকায় সশস্ত্র পুরুষ তীরবেগে সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া মহারাজকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। মহারাজের সতর্কিত রক্ষিবৃন্দ ক্ষিপ্রহস্তে হত্যাকারীকে তৎক্ষণাৎ বন্দী করিয়া না ফেলিলে, হয়ত মহারাজ জেতের পরমায়ু সে দিন নিঃশেষ হইয়া যাইত।

মহারাজ কিন্তু এইরূপ দুর্ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি ধীর অবিকম্পিত স্বরে বন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য তুমি আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিলে?"

নির্ভীক বন্দী দর্পের সহিত বলিল, "আমি তোমাকে এই রাজ্যের ও প্রজাগণের শত্রু বলিয়া মনে করি। তুমি আমাদের পিতৃপিতামহগণের জাতিগত ধর্ম্ম বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ। তুমি অন্যায় ও অধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিতেছ। তুমি জীবিত থাকিলে যে তোমার পাপে আমরা সবংশে নিহত হইব!"

মহারাজ জেত মৃদু হাস্য করিলেন। রক্ষিগণকে বন্দীর বন্ধন মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন। দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ বন্দীর দক্ষিণ

হস্তে দৃঢ়-মুষ্টিবদ্ধ তীক্ষ্ণ ছুরিকা তখনও ঝক্‌মক্ করিতেছে। মহারাজ, বন্দী ব্যতীত অপর সকলকে সে স্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। বিস্মিত প্রহরিগণ তৎক্ষণাৎ মহারাজের আদেশ পালন করিল। তাঁহার বিশ্বস্ত পার্শ্বচরেরা ও অনুগত বন্ধুবর্গও অনিচ্ছার সহিত একে একে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। ভূপতির এইরূপ নির্ব্বোধের মত অসম-সাহসিকতায় তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

বন্দী তাহার দৃঢ় সুগঠিত বাহুদ্বয় বিশাল বক্ষের উপর সম্বদ্ধ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে দাঁড়াইয়াছিল। রাজ-ক্ষমতার উপর একটা অসীম তাচ্ছিল্যের ভাব তাহার দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইতেছিল! বন্দীর এই স্বেচ্ছাকৃত অসম্মান দেখিয়াও মহারাজ কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না। তিনি সিংহাসন হইতে নামিয়া বন্দীর কাছে আসিলেন এবং তাহার উভয় বাহু বন্দীর স্কন্ধের উপর রাখিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। কি প্রশান্ত নির্ম্মল দৃষ্টি! রাজার সে চক্ষুতে রাগ নাই, ঘৃণা নাই, ভৎর্সনা নাই, বেদনা নাই—শুধু বন্দীর প্রতি অসীম অনুকম্পায় সে আঁখি দু'টী পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে!

মহারাজ বন্দীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন, "সেই একই বিশ্বপিতা আমাদের উভয়কে সৃজন করিয়াছেন, আমরা যে দুই ভাই। আমরা উভয়ে এই একই জননী ধরিত্রীর ক্রোড়ে লালিত; আমাদের কি ভাই পরস্পরের হিংসা করা উচিত? পিতৃপিতামহগণের নির্ম্মিত গৃহ যদি জীর্ণ হইয়া যায়, যদি বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে, তবে তাহা চূর্ণ করিয়া নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করা

কি কর্ত্তব্য নয়? ভাই! আমার অপরাধ যদি গুরুতর হইয়া থাকে, তবে এস ভাই, আমার বক্ষে এস; আমাকে মার্জ্জনা কর। আমার এ রাজসিংহাসন গ্রহণ করিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দাও, আমি তোমার সকল দুষ্কৃতিভার মাথায় করিয়া লইয়া চলিয়া যাই।"

তা'রপর যখন সশঙ্কিত রক্ষী ও অনুচরবর্গ বহুক্ষণ মহারাজের কণ্ঠস্বর শুনিতে না পাইয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া সকলে সভাগৃহে প্রবেশ করিল, তখন তাহারা দেখিল, সেই ভীমকায় বন্দী মহারাজের বক্ষে মুখ লুকাইয়া বালকের মত কাঁদিতেছে! তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তাহার দৃঢ়মুষ্টিচ্যুত হইয়া গৃহতলে লুটাইতেছে! আর তাহাদের মহারাজের দিব্যশ্রীমণ্ডিত মুখখানি এক স্বর্গীয় করুণার উজ্জ্বল আলোকে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে!

৪

পূর্ব্ব গগনে উষার রক্তিম রাগ ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিতেছে। বালারুণ-কিরণ-স্পর্শে কানন-ভূমির শিশিরসিক্ত শ্যাম তৃণরাজি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মহাবোধিসত্ত্ব বৃক্ষমূলে শ্রীঘন মুনীন্দ্রবুদ্ধ পদ্মাসনে সমাসীন। সহস্র শ্রমণ আজ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া উদান-গাথা গায়িতেছেন, চারিপার্শ্বে আজ ভিক্ষু ভিক্ষুণীর মেলা বসিয়া গিয়াছে! তাঁহার অতি সন্নিকটে আসিয়া বনের পাখীরা নির্ভয়ে নাচিয়া গায়িয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। তাঁহার পদতলে নিমীলিত-নেত্র এক ভীমকায় সিংহ এবং তাঁহার মুখের পানে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া এক দুর্দ্দান্ত শার্দ্দূল তাঁহাকে

সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতেছে। এক অজগর তাহার বিচিত্র ফণা বিস্তার করিয়া প্রভুর সম্মুখে নৃত্য করিতেছে! কে যেন আজ তাহাদের জীব-হিংসা ভুলাইয়া দিয়াছে। সে অরণ্য-প্রান্তে সে দিন প্রভাতে দিবসের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে যেন মহাপ্রেমের জাগরণ হইয়াছে!

ধীর-সংযত-পদবিক্ষেপে মহারাজ জেত আসিয়া অবলুণ্ঠিত শিরে প্রভুর পাদবন্দনা করিলেন। তিনি আজ একাকী পদব্রজে সেখানে আসিয়াছেন। তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ নাই, তাঁহার পরিধানে দীনতম ভিক্ষুর চীরবাস!

প্রভু গৌতম বুদ্ধ আজ দীনবেশ মহারাজের ধূলি-বিলুণ্ঠিত অনাবৃত শিরে তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—

"রূপ-সঞ্ঞ-বিমুত্তো উখোবচ্ছ গম্ভীরো
অপ্পমেয্যো দুপ্পবিয়োগাহো মহাসমুদ্দো।"

হে বৎস! নাম-রূপের জ্ঞান হইতে বিমুক্ত হইয়া গম্ভীর, অপ্রমেয়, অতলস্পর্শ মহাসমুদ্রের ন্যায় হও।

ধীর সমীরণ এত সুমধুর ও সৌরভময় হইয়া আর কোনও দিন বোধ হয় বহে নাই। পাখীসারীরা এমন সুন্দর কল-তান বুঝি আর কখনও ধরে নাই! সে মহারণ্যের গভীর শান্তি বুঝি এমন গভীরতর আর কোনও দিন হয় নাই—যেমন সেই দিন হইয়াছিল, —যে দিন কাঞ্চন্যাধিপতি মহারাজ জেতবীর তথাগত গৌতম-পাদমূলে নতজানু হইয়া মহাভিক্ষুব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

মাহিদা

আথেলিয়ায় ধীবরব্যবসায়ী পাহাড়িয়াদের মধ্যে বৃদ্ধ এলবুকারের ধনী বলিয়া খ্যাতি ছিল। এলবুকার-পরিবারের মধ্যে তাহার স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র পাকু ব্যতীত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। পাকুর বয়স ২১ বৎসর। কৃষ্ণবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ অঙ্গসৌষ্ঠব। পাকু অদ্বিতীয় সন্তরণপটু। সমুদ্রই তাহার আশৈশব সঙ্গী, উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ তাহার রঙ্গক্রীড়ার নিত্যসাথী।

একদিন সমুদ্রকূলস্থ পর্ব্বতশিখরে বেড়াইতে গিয়া পাকু দেখিল, পর্ব্বতের উপর একটী পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা বসিয়া আছে। মার্জ্জিত কৃষ্ণবর্ণ, সুস্থ, সবল, সুঠাম দেহলতা, স্ফুটনোন্মুখ যৌবনপ্রভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! কবিকল্পিত মুখশ্রী। অর্দ্ধ-অনাবৃত পৃষ্ঠদেশে ফণিনীগঞ্জিত বেণী দুলিতেছে। একরাশি পার্ব্বতীয় পুষ্প চয়ন করিয়া বালিকা মালা গাঁথিতেছে, আর একটীর পর আর একটী নিজেরই গলায় পরিতেছে। পাকু বালিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল; সহসা একটী ফুলশর আসিয়া আজ এই সর্ব্বপ্রথম তাহার অক্ষত হৃদয় বিদ্ধ করিল! পাকু মুহূর্ত্তে স্থির করিয়া ফেলিল যে, এই বালিকাকেই সে বিবাহ করিবে।

বালিকার নাম মাহিদা; সে পাকুদেরই প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা পল্‌তার কন্যা—একমাত্র নয়নরঞ্জন স্নেহের পুত্তলী। মাহিদার

প্রকৃতিগত একটা বিশেষত্ব ছিল। অন্য বালিকারা যেমন দল বাঁধিয়া থাকিতে ভালবাসে, পল্লীর বালকগণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া খেলা করে, মাহিদা তেমনটি পারে না। সে নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসে এবং বালকগণের ত্রিসীমানায় যাইতে চাহে না। এইজন্যই, প্রতিবেশিনীর কন্যা হওয়া সত্ত্বেও, পাকু তাহাকে এতদিন এমন করিয়া দেখিবার সুযোগ পায় নাই।

তৎক্ষণাৎ বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য, পাকু মাহিদার নিকট অগ্রসর হইল। পদশব্দ পাইয়া মাহিদা সচকিতে পাকুর দিকে ফিরিয়া চাহিল; পাকু সেই বড় বড় কাল কাল টানা চোখ দু'টীতে কি যেন একটা মধুর তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিল!

পাকু তাহার নিকটে আসিতেই বালিকা মালাগাঁথা বন্ধ করিয়া, অবিলম্বে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং পাকু তাহার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিতেই, বালিকা, ব্যাধবাণ-ভয়-ভীতা সারসীর মত, চীৎকার করিয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। পাকুও বালিকার অনুসরণ করিল।

গিরিশিখর-মূলের নিম্ন দিয়া যে অল্পপরিসর অসমতল পথরেখা পর্ব্বতশ্রেণীকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার উপর দিয়া মাহিদা নিঃশঙ্কচিত্তে, দ্রুতগামী হরিণীর মত এত শীঘ্র ছুটিয়া পলাইতেছিল যে, পাকুর মত ক্ষিপ্রপদ যুবকের পক্ষেও তাহাকে ধরা অসম্ভব হইত—যদি না সেই সঙ্কীর্ণ পথটি ক্রমশঃ সমুদ্রগর্ভে যাইয়া শেষ হইত। ধীবরবালা মাহিদাও সন্তরণনিপুণা ছিল;—আর পথ

নাই দেখিয়া, অগত্যা বালিকা সমুদ্রগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িল; হাসিতে হাসিতে প্রফুল্লচিত্ত পাকুও সঙ্গে সঙ্গে জলে তাহার অনুসরণ করিল।

তরুণ তরুণী উভয়ে মিলিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সমুদ্রবক্ষ আলোড়িত করিল। প্রথমে পাকুর মত সন্তরণপটুও মাহিদার সন্তরণ-চাতুর্য্যের নিকট পরাভূত হইতেছিল; কিন্তু বালিকা অচিরে শ্রান্ত হইয়া পড়িল, পাকু গিয়া তাহার শ্রমক্লান্ত অবসন্ন দেহলতাখানি ধরিয়া ফেলিল। মাহিদা তখন এত পরিশ্রান্ত যে, সে তাহার সেই সলিলসিক্ত সুশ্রী মুখখানি আর জলের উপর তুলিয়া রাখিতে পারিতেছিল না—বারবার তাহা তরঙ্গের মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিল।

মাহিদাকে পালকের মত তুলিয়া লইয়া পাকু সমুদ্রের পার্ব্বত্য তটে উঠিয়া আসিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাহারও শরীর তখন নিতান্ত অবসন্ন; তথাপি সে মাহিদার শুশ্রূষা করিতে লাগিয়া গেল। পাকুর একাগ্র যত্নে অল্পক্ষণের মধ্যেই মাহিদা বেশ সুস্থ হইল; পাকু তখন প্রেমবিগলিত হৃদয়ে মাহিদার হাত দু'খানি আপন হাতের মধ্যে লইয়া—তাহার সেই সদ্যঃসলিলধৌত নির্ম্মল মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া—বিবাহের প্রস্তাব করিল। মাহিদা সজোরে তাহার হাত দু'খানি মুক্ত করিয়া লইয়া, দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল,—সে কখনই বিবাহ করিবে না। পাকু কাতরভাবে তাহার অসম্মতির কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মাহিদা তাহার মুখের উপর স্পষ্ট করিয়া বলিল যে, সে পুরুষজাতিকে আন্তরিক

ঘৃণা করে; তাহাদের সে কখনও ভালবাসিতে পারিবে না।—তাহারা অকৃতজ্ঞ—তাহারা নিষ্ঠুর—তাহারা নারীর জীবনকে কষ্টকর করিয়া তোলে; সে কখনও বিবাহ করিবে না, কখনও তাহাদের অধীন হইবে না।

পাকু কত তোষামোদ করিল, জানু পাতিয়া কত সাধিল, কত যুক্তিতর্কের অবতারণা করিল,—মাহিদা সে সকলে কর্ণপাত করিল না; একগুঁয়ে মেয়ের মত কেবল ঘাড় নাড়িয়া তাহার অসম্মতি জানাইতে লাগিল। পাকু তখন শপথ করিয়া বলিল যে, সে কখনও তাহাকে কষ্ট দিবে না, সে তাহাকে আপন কলিজার চেয়েও ভালবাসিবে। মাহিদা এবার রাগিয়া খুব জোরে জোরে রুক্ষস্বরে বলিল, "আমি তোমার ভালবাসা চাই না, আমি বিবাহ করিব না।"

ঈপ্সিতপত্নীর নিকট এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও পাকু কিছুমাত্র নিরুৎসাহ বা ক্রুদ্ধ হইল না। যদিও সে সেদিনের মত তথা হইতে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু মাহিদার সেই ঘন ঘন ললিত গ্রীবাসঞ্চালনে বিবাহে অসম্মতি-প্রকাশ,—সেই রাগরঞ্জিত ও কম্পিত ওষ্ঠ, দৃঢ় ও ক্রোধব্যঞ্জক অস্বীকার উক্তি পাকুকে মাহিদার প্রতি আরও অধিকতররূপে আকর্ষণ করিল। মাহিদাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার বলবতী আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে লইয়া পাকু গৃহে ফিরিল এবং তাহার স্নেহময় জনকজননীকে তাহার পরিণীত হইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিল এবং সেই সঙ্গে ইহাও তাহাদের

জানাইল যে, প্রতিবেশিকন্যা মাহিদা ব্যতীত অপর কোনও বালিকাকে সে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে না।

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেইদিনই পাকুর মাতা, বৃদ্ধা পল্‌তার নিকট, পুত্রের বিবাহের ঘটকালি করিতে গিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিল। মাহিদার মাতা পল্‌তা, সসম্মানে সে প্রস্তাব গ্রহণ করিল। তখন বিবাহের দিনস্থির করিয়া—পাকুর মাতা সহাস্যমুখে বাটী ফিরিল এবং পরম উৎসাহের সহিত পুত্রের বিবাহের আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিল।

একমাত্র প্রিয় পুত্রের বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে ধনী এলবুকার-গৃহে মহাধূম পড়িয়া গিয়াছে। সারা গ্রামখানিতে হুলস্থূল। মাহিদা কিন্তু এই বিবাহের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইয়াছে।

অনেক ভাবিয়া সে তাহার মার নিকট গেল এবং বিবাহে তাহার অসম্মতি জানাইল। পল্‌তা, কন্যার এই স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া—তাহাকে যথেষ্ট ভৎ‍র্সনা করিল এবং রুক্ষস্বরে তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, যেমন সকল মেয়েরই বিবাহ হয়, তাহারও সেইরূপ হইবে। পাকুকে কন্যাদান করিবে বলিয়া সে আঞ্জীগো দেবের শপথ লইয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে; সুতরাং, তাহার বিবাহ বন্ধ থাকিবে না। কারণ, অঙ্গীকারভঙ্গ করিলে, আঞ্জীগো দেবের অভিসম্পাতে তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।

মাহিদা বুঝিল, জননীকে আর অনুরোধ করা বৃথা,—তিনি বিবাহ দিবেনই ; কিন্তু প্রাণ থাকিতে মাহিদা বিবাহ করিবে না—সে যে পাকুকে স্পষ্টই বলিয়াছে যে, পুরুষজাতিকে সে ঘৃণা করে! মাহিদা বড় ভাবনায় পড়িল ; আপনাকে নিতান্ত বিপন্ন বলিয়া মনে করিল। দুই দিন ভূমিশয্যায় পড়িয়া অনেক কাঁদিল ; কিন্তু কোনও উপায় স্থির করিতে পারিল না!—অবশেষে, বিবাহের পূর্ব্বরাত্রিতে, সে আঞ্জীগো দেবের শরণ লইবার জন্য ব্যাকুল হইল! দেবতার অভিশাপেই পাকুর সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে, স্থির করিয়া—দেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য, মাহিদা কাহাকেও কিছু না বলিয়া—সন্ধ্যার অন্ধকারে গোপনে কুটীর পরিত্যাগ করিল এবং গ্রাম-প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত পাহাড়িয়াদের জাতীয় দেবতা "আঞ্জীগো"র মন্দিরে "বিপন্মুক্তির প্রদীপ" জ্বালিয়া দিতে চলিল।

পাহাড়িয়াদের সহসা কোনও বিপদের সম্ভাবনা হইলে, তাহারা তাহাদের দেবতা আঞ্জীগোর শরণাপন্ন হইত এবং সেই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিগ্রহের সম্মুখে একটা মৃন্ময় প্রদীপ জ্বালিয়া দিত। যদি প্রদীপটা তৎক্ষণাৎ নিবিয়া যায়, পাহাড়িয়াদের বিশ্বাস—সে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব ; কিন্তু যদি প্রদীপটা কিছুক্ষণ জ্বলে, পাহাড়িয়ারা বিশ্বাস করে যে, বিপদ্টা কাটিয়া গেল।

আকাশ তখন ঘনঘটাচ্ছন্ন, বায়ু অচঞ্চল এবং সমুদ্রবক্ষ অসম্ভব

স্থির ;—যেন সহসা তাহার বিরাট বক্ষস্পন্দন এক নিমেষে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে! নীরব গম্ভীর প্রকৃতি যেন একটা ভীষণ প্রলয়-ঝঞ্ঝার অপেক্ষা করিতেছে! পথে—গ্রামপ্রান্তে—সমুদ্রকূলে—কোথাও জনপ্রাণীকেও দেখা যাইতেছে না। সকলেই যেন আজিকার এই ঘোর অন্ধকারময় প্রকৃতির ভীষণতা অবগত হইয়া, ভীত হইয়াছে! দূরে দূরে আঁধার মেঘের পশ্চাতে পর্ব্বতমালার গগনস্পর্শী কৃষ্ণবর্ণ চূড়াগুলা যেন প্রেতের মত মাথা উঁচু করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক্ এই সময়, বিপন্ন কাতর নির্ভীক মাহিদা একাকী আঞ্জীগো দেবের মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছে।

মন্দিরদ্বারে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, এতক্ষণের স্তব্ধ ঝঞ্ঝা দেখা দিল,—স্থির-বায়ু সহসা অস্থির হইয়া উঠিল; প্রশান্ত সমুদ্রবক্ষ মুহূর্ত্তে ফুলিয়া উঠিয়া ভীষণ তরঙ্গ তুলিল। বিকট বজ্রগর্জ্জন মাথায় করিয়া, আকাশবিস্তীর্ণ পুঞ্জীকৃত মেঘরাশি অকস্মাৎ যেন প্রলয়ের বারিরাশি লইয়া, পৃথিবীর বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল! ঠিক সেই সময়ে, দ্বারের প্রস্তরখণ্ড ঠেলিয়া, মাহিদা মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

"আমি বিবাহ করিব না!—আমি কখনই বিবাহ করিব না!—আমি কিছুতেই তাহাকে বিবাহ করিতে পারিব না!—এ দারুণ বিবাহ-বিপদ্ হইতে আমায় মুক্ত কর, দেবতা!"

প্রস্তর-নির্ম্মিত ভীষণমূর্ত্তি আঞ্জীগোদেবের চরণতলে বিলুণ্ঠিত মাহিদা মর্ম্মন্তুদ কাতরস্বরে এইরূপ প্রার্থনা করিতেছিল।

ভিত্তিগাত্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে বহির্জগতের প্রবল ঝঞ্ঝা, মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া, মন্দিরাভ্যন্তরে লুণ্ঠিত মাহিদার অন্তরের উন্মত্ত ঝঞ্ঝাকে উপহাস করিতেছিল! মাহিদার "বিপদ্-মুক্তির প্রদীপ"টা সে বায়ুর প্রচণ্ড তাড়নায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল! যদি নিবিয়া যাইত, দেবতার চরণে মাহিদার সকল নিবেদন ব্যর্থ হইত। কিন্তু ঝঞ্ঝাঘাত সহ্য করিয়াও 'মুক্তি-প্রদীপ' জ্বলিতে লাগিল।

মাহিদা, প্রসন্নচিত্তে দেবতার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরিল। তাহার প্রাণে তখন একটা শান্তি আসিয়াছে;—বুকের উপর হইতে একটা গুরুভার নামিয়া গিয়াছে; সে যেন আবার সহজে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল!

বাটী ফিরিয়া মাহিদা দেখিল, তাহার মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া কাঁদিতেছে, আর ঝড়বৃষ্টির উদ্দেশে অজস্র গালি দিতেছে! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ভাবী জামাতার অমঙ্গল-আশঙ্কায় তাহার মাতা কাতর হইয়া পড়িয়াছে! কারণ পাকু, বৃদ্ধ পিতা এলবুকারের সহিত, আজ প্রভাতে মৎস্য ধরিতে গিয়াছে—এখনও ফেরে নাই। সহসা এই ভীষণ দুর্য্যোগ! আর তাহারা পিতা-পুত্রে এসময়ে সমুদ্রবক্ষে! মাহিদা এ সংবাদ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল! তাহার চোখেমুখে-ললাটে—প্রতি সূক্ষ্ম শিরাতে ব্যথিত চিন্তা-রেখা ফুটিয়া উঠিল! সে ধীরে ধীরে, মাটির উপর যেন তাহার শরীরের সমস্ত ভারটি রাখিয়া বসিয়া পড়িল!

দেবতার চরণে কায়মনে নিবেদন করিয়াছে বলিয়া, এত শীঘ্র সে যে এরূপ কঠোর প্রত্যুত্তর পাইবে—মাহিদা তাহা একবারও ভাবে নাই! প্রভু আঙ্গাগো দেবের নিকট সে এই বিবাহ-সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সকাতরে প্রার্থনা করিয়াছিল বটে; কিন্তু সে তো এ ভাবে মুক্ত হইতে চায় নাই! এ উপায়ে উদ্ধার পাইবার কল্পনা পর্য্যন্ত সে তো একবারও করে নাই!—"না না এ উপায়ে নয়!—এ উপায়ে নয়!" তাহার প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"না না এ উপায়ে নয়!" মাহিদা ব্যাকুল হইয়া নিঃশব্দে—আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল! কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল, "যদি পাকু আর না ফেরে!—যদি এই দুর্য্যোগে সমুদ্রের উপর পিতা-পুত্রের কোনও বিপদ্ হয়, তবে তো আমিই তাহাদের হত্যার কারণ হইব!—হায়, দেবতা! এ কি তোমার কঠোর বর! এ কি নিষ্ঠুর দান প্রভু! আমি তো এ মূল্য দিয়া আমার মুক্তিলাভ করিতে চাহি নাই, দয়াময়!" দারুণ মানসিক যন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তায় মাহিদা সারারাত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতে যদি পাকু ফিরিয়া আসিত, তাহা হইলে সে আপনাকে একজন প্রেমে-পাগলিনী প্রণয়িনীর প্রসারিত বাহুপাশে আবদ্ধ দেখিতে পাইত! কারণ, মাহিদা সে স্ত্রীস্বভাব-সুলভ জিদ্ তখন ভুলিয়া গিয়াছে; তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হইয়া যৌবনতেজো-গর্ব্বিতা তরুণীর একগুঁয়েমি তখন ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে!

পাকুর প্রতি তাহার সেই অন্যায় অসদ্ব্যবহার সত্ত্বেও তাহার প্রতি সেই উদার যুবকের অসীম স্নেহ ও গভীর প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের যে কতখানি মূল্য—কতখানি মর্য্যাদা—কিশোরী এতক্ষণে যেন তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে।

গতকল্য দুর্য্যোগময়ী ভীষণা রজনীতে যাহারা গ্রাম হইতে অনুপস্থিত ছিল, অদ্য প্রাতে তাহারা সকলেই তাহাদের উৎকণ্ঠিত গৃহপ্রাঙ্গণে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে; কেবল স্বামিপুত্রের অদর্শনে কাতরা ব্যাকুলা এলবুকার-পত্নী সমুদ্র-বেলায় তাহাদের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। মাহিদাও পাকুর সন্ধানে বাহির হইয়াছে। তাহার সেই সূর্য্যাস্তকালীন কমলিনীর মত বিষাদমলিন মুখখানি, স্ফীত রক্তাভ নয়নদ্বয় তখনও পর্য্যন্ত অশ্রুচিহ্নিত বিবর্ণগণ্ড, যাহারই দৃষ্টিগোচর হইল, সেই মাহিদার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না! বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া সকলেই বলিল, পাকুর বাগ্‌দত্তা যে তাহার বিপদে এত কাতর হইয়াছে, ইহা পাকুর পরম সৌভাগ্য।

সারানিশি উদ্দাম নৃত্য করিয়া, সমুদ্র যেন তখন অলসনিদ্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছে! বাল-সূর্য্যকরোদ্ভাসিত উজ্জ্বল নীলাকাশ যেন তখন হাসিতে হাসিতে সকলকে বলিতেছে যে—গতরাত্রিতে সে তাহার ভাণ্ডারশূন্য করিয়া কাল মেঘগুলোকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। মাহিদা বিকলচিত্তে সমুদ্রকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল; বহুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া, সেই অসীম প্রসারিত সমুদ্রবক্ষের

যতদূর দেখা যায়—অভাগিনী প্রাণপণে, তাহার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া, তাহার আরও সম্মুখে—একেবারে সমুদ্রের শেষ অবধি —দেখিতে পাইবার জন্য, বার বার বিষম প্রয়াস করিল— কিন্তু প্রতিবারই তাহার চক্ষু দুইটী বাষ্পে ভরিয়া উঠিল; এবং, প্রতিদিন সে সমুদ্রের সহিত আকাশকে যেখানে মিশিতে দেখে, আজও তাহার অধিক দেখিতে না পাইয়া, নিষ্ফল হতাশার একটা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে সেখানে বসিয়া পড়িল! পাকুর মাতাও সেই সময় কাঁদিতে কাঁদিতে সমুদ্রতীরে আসিয়া বালুরাশির উপর আছড়াইয়া পড়িল এবং তাহার স্বামি-পুত্রকে লওয়ার জন্য বক্ষে করাঘাত করিয়া, দেবতার নিকট সমুদ্রের বিরুদ্ধে মর্ম্মভেদী করুণ অভিযোগ করিতে লাগিল। সে আজ স্বামিপুত্রহারা পাগলিনী! তাহাকে দেখিয়া, মাহিদার করুণ কোমল হৃদয়খানি যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল; বালিকার শোককাতর চক্ষু দুইটির এমনি ভাব হইল, যেন তখনই বিদীর্ণ হইয়া রক্তপ্রবাহিত হয়! মাহিদা দুই হাতে আপনার উত্তপ্ত বক্ষপঞ্জরগুলা সবলে চাপিয়া ধরিল, যেন একটা প্রচণ্ড আঘাতে তাহার প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে; কিন্তু অধিকক্ষণ আর সে সহ্য করিতে পারিল না,—মুহূর্ত্তে ছুটিয়া আসিয়া পাকুর মার বেদনাতুর বুকের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!

মাহিদার যখন জ্ঞান হইল, তখন বেলা অনেক হইয়াছে।

প্রখর রবিকরে বেলাভূমির বালুকণাগুলি এই দুইটী শোকাতুরা রমণীর তপ্তবুকের মতই আগুন হইয়া উঠিয়াছে! পাকু ও এলবুকারের তখনও কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পাকুর মার রক্তনয়ননিঃসৃত অজস্র অশ্রুধারা তখনও অভাগিনীর শীর্ণগণ্ড বহিয়া—বক্ষবস্ত্র সিক্ত করিতেছিল। মাহিদা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল—বৃদ্ধার অশ্রু মুছাইয়া দিল; তার পর তাহার মুখের পানে চাহিয়া দৃঢ় অথচ একান্ত করুণ কণ্ঠে বলিল, "মাগো! তুমি আর কাঁদিও না—তাঁহারা নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিবেন, সমুদ্র তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, সমুদ্রই তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিবেন।" পাকুর জননী দুই হাতে ভাবী পুত্রবধূকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, তাহার ললাটচুম্বন করিল, বৃদ্ধার শূন্যবক্ষ যেন ক্ষণেকের জন্য পূর্ণ হইল—তাহার মর্ম্মদাহ যেন একটু শীতল হইল। গভীর স্নেহে মাহিদার শিরে তাহার শীর্ণ করতল বুলাইয়া দিতে দিতে, বেদনারুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "মাগো! তুমি চিরজীবিনী হও; প্রভু আঙ্গীগো দেবের কৃপায় তোমার বাক্য সত্য হউক!" আঙ্গীগো দেবের নাম শুনিয়া মাহিদা শিহরিয়া উঠিল! বৃদ্ধা বলিতে লাগিল, "কিন্তু মা! আমার অদৃষ্ট বুঝি পুড়িয়াছে! আমার পাকু কি তাহার পিতাকে লইয়া আর ফিরিয়া আসিবে?" মাহিদা এবারও স্থির অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "সমুদ্র তাঁহাদের আশ্রয় দিয়াছেন, সমুদ্রই তাঁহাদের ফিরাইয়া দিবেন!"

দিনের পর দিন চলিয়া গেল—স্নেহময়ী বৃদ্ধা মাতাকে

শোকানলে দগ্ধ করিবার জন্য, শান্তিপূর্ণ আনন্দমুখরিত প্রফুল্ল গৃহপ্রাঙ্গণটি শ্মশান করিবার জন্য, অথবা বুঝি সেই উদ্ধত বালিকা মাহিদাকে শাস্তি দিবার জন্য, বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া পাকু আর ফিরিল না। সকলেই তাহাদের আশা ছাড়িয়া দিল; সকলেই স্থির করিল, সে দিনের সে ভীষণ দুর্যোগে নিশ্চয়ই তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু মাহিদা সে কথা শুনিল না, তাহার ধ্রুব-বিশ্বাস যে, সমুদ্র তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, সমুদ্রই তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিবেন। এই বিশ্বাসবশে সরলা বালিকা প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া, সমুদ্রকূলের সেই গিরিশিরে গিয়া, তাহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় বসিয়া থাকিত। তাহার সেই ব্যাকুল শূন্যদৃষ্টির সম্মুখে অনন্ত নীল বারিরাশি নিত্য একই ভাবে নৃত্য করিত। কতবার কত পরিচিত নৌকা কূলে আসিত, আবার ফিরিয়া যাইত; কিন্তু মাহিদা যাহাদের আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছে, তাহারা কেহই আর ফিরিত না।

নানা সুখদুঃখ মাথায় করিয়া দেখিতে দেখিতে পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে। নূতন নূতন ঘটনার আবর্ত্তে পড়িয়া, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের সে দুর্ঘটনার কথা প্রায় অনেকেই বিস্মৃত হইয়াছে। তদবধি আর কেহই মাহিদাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিতে সাহসী হয় নাই। মাহিদা ইহার জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত নয়। শুধু বৃদ্ধা পল্‌তা, মাঝে মাঝে তাহার অবোধ কন্যার পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলে! তাহার পুত্র বলিতে—তাহার কন্যা

লতে—মাহিদাই যে একমাত্র সম্বল!—মাহিদা তাহার কাতরা
ননীকে প্রত্যহ বুঝাইয়া বলিত, "ও মা! তুমি কাঁদিও না।
মার জামাতা বাঁচিয়া আছে, সমুদ্র তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছেন,
দ্রই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিবেন।"

মাহিদার এই ভিত্তিহীন ভবিষ্যদ্বাণী একদিন সত্য সত্যই বাস্তব
ইয়া দাঁড়াইল। উন্মাদিনীর মত হাস্য করিতে করিতে একদিন
কুর মা ছুটিয়া পল্‌তার বাটীতে আসিল এবং রুদ্ধশ্বাসে বলিতে
গিল, "ওগো! তোমরা—এস গো, দেখ্‌বে এস; আমাদের
কু আজ ফিরে এসেছে। ওরা কিন্তু বলেছিল, ডুবে গেছে—
খ্‌বে এস গো দেখ্‌বে এস!" পাকুর মাতা নীরব হইবার
র্ব্বেই, বাহিরে একটা বহুজনকণ্ঠোচ্চারিত উচ্চ আনন্দধ্বনি
শ্রিত হইল!

বিদ্যুৎবেগে পল্‌তা কন্যার হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল এবং
বিলম্বে নিরুদ্দিষ্ট জলমগ্ন ধীবরবালকের অভ্যর্থনার্থ সমবেত
নতার সহিত মিশিয়া গেল! পাকু সেই বিস্ময়োৎসুক
নমণ্ডলীকে তাহাদের জলমগ্ন হইবার যে ইতিহাস বলিতেছিল,
খে মুখে সে গল্পের কতকটা তাহাদের কাণে আসিয়া পৌঁছাইল।
াহারা শুনিল যে, ঝড়ের বেগে পাকুদের নৌকা ছুটিয়া বহুদূরে
কটা পর্ব্বতের উপর গিয়া পড়ে, সেখানে তাহার বৃদ্ধ পিতার
ত্যু হয় এবং সে নিজে দুইদিন অনাহারে সেইখানে ছিল;
তার পর, ঘটনাক্রমে, একখানা বড় জাহাজ সেইখান দিয়া

যাইতেছিল,—পাকুর চীৎকার শুনিয়া, তাহাকে তুলিয়া লয়। পাকু এতদিন সেই জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট কর্ম্ম করিতেছিল; সম্প্রতি জাহাজখানি এদেশে আসায়, পাকু ছুটী লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে।

পাকুর ইতিহাস শুনিয়া, সকলেই তাহাকে ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া স্থির করিল; এবং সে দু'দিন না খাইয়া পর্ব্বতের উপর ছিল শুনিয়া, কয়েকজন দয়ার্দ্রচিত্ত প্রতিবেশী তাহাকে কয়েকদিন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইল। তার পর, এক নির্জ্জন সন্ধ্যায় পাকুর সহিত মাহিদার সাক্ষাৎ হইল। পাকু মাহিদাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল!—এতো পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের, সেই স্ফুটনোন্মুখ যৌবনপ্রভায় উজ্জ্বল, মার্জ্জিত কৃষ্ণবর্ণ সুস্থ সুগোলকায় সুন্দরী মাহিদা নয়! পাঁচ বৎসর ক্রমাগত দুশ্চিন্তায় দগ্ধ হইয়া, কত দুঃস্বপ্নময় বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়া—তীব্র অনুশোচনায় কাতর মাহিদার সে পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অসম্ভব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল!—যৌবনের অর্দ্ধপথে সে যেন বার্দ্ধক্যকে ডাকিয়া আনিয়াছে! উচ্ছ্বসিত রূপযৌবনের যে উন্মাদনাময় আকর্ষণে মাহিদার জন্য পাকু উন্মত্ত হইয়াছিল, মাহিদার সে আকর্ষণ আর নাই! পাঁচ বৎসর তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে ঝড় বহিয়াছে—যে প্রলয় হইয়া গিয়াছে, স্বভাবকোমলা বালিকা তাহার আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! তাই, বোধ হয়, পাকু, সে ভগ্নপ্রতিমার সহিত সম্ভাষণমাত্র না করিয়া, অন্যপথে চলিয়া গেল!

পাকুর এই অন্যায় উপেক্ষায় মাহিদার দারুণ অপমান বোধ হইল। তাহার মুখখানি শাকের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। অভিমান-অশ্রুভারাক্রান্ত অভাগিনী, বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে—অবনতমস্তকে গৃহে ফিরিয়া গেল।

তিন-চারদিন ক্রমাগত ভাবিয়া ভাবিয়া, মাহিদার মনে হইল, —পাকু নিশ্চয় তাহার উপর রাগ করিয়াছে, নতুবা সে কি তাহাকে ভুলিতে পারে?—মাহিদার চক্ষের সম্মুখে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের একটী রমণীয় অপরাহ্ণ ভাসিয়া উঠিল। সেই জানু পাতিয়া—দীন ভিক্ষুকের মত—তাহার নিকট পাকুর প্রেমভিক্ষা, তাহার সেই ব্যাকুলনয়নের পিপাসিত করুণদৃষ্টি—মাহিদার চরণে আপনার প্রাণ ঢালিয়া দিবার জন্য তরুণ যুবকের সেই আবেগময় আকুল আগ্রহ! মাহিদার একে একে সকলই মনে পড়িতে লাগিল! সেই পাকু আজ এমন করিয়া, তাহার সহিত একটী কথাও না কহিয়া, চলিয়া গেল! না—না—এমন কখন হ'তেই পারে না! নিশ্চয় তাহার উপর পাকু অভিমান করিয়াছে।—কেন সে পোড়ারমুখী, সকলের আগে যাইয়া, তাহাকে অভ্যর্থনা করে নাই? কেন সে প্রিয়তমের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া—তাহার বাহুলগ্ন হইয়া—তাহার দীর্ঘপ্রবাসের দুঃখকাহিনী শোনে নাই? মাহিদা, আপনাকে সহস্র ধিক্কার দিয়া সেই মুহূর্ত্তেই পাকুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। মনে মনে স্থির করিল,—সে পাকুর পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া লইবে;—কেমন করিয়া তাহার বিপদে

সে সারানিশি ভূমিতে লুটাইয়া কাঁদিয়াছিল, কেমন কি
প্রত্যহ তাহার আশায় সে সমুদ্রকূলে সারাদিন প্রতীক্ষা কি
'বসিয়া থাকিত, সে সব কথা বলিবে এবং পাকুকে এখন ব
ভালবাসে, বুক চিরিয়া তাহা দেখাইয়া আসিবে!

অনেক অনুসন্ধান করিয়া মাহিদা পাকুর সন্ধান পাইল; বি
সেখানে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে ভাগ্যপীড়িতা অভাগিনী
পাকুর নিকট আর ক্ষমা চাওয়া হইল না—আর তাহাকে তা
সে কাতর হৃদয়ের গভীর অসীম প্রেমের কথা বলা হ
না। মাহিদা গ্রামপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দেখিল, সমুদ্রতটবর্ত্তী সু
অতীত কালের এক তিন্দুক তরুতলে দাঁড়াইয়া—তাহারই দ
সম্পর্কীয়া ভগিনী লুনিয়ার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া, সহাস্য প্রফুল্লম
পাকু বলিতেছে, "লুনি! লুনি! আমায় তুই বিয়ে কবি
আমি তোকে বড্ড ভালবাসি!"'

অঘটন

১

সে দিন শচী সবে খেয়ে উঠ্‌তে-না-উঠ্‌তেই প্রতিবেশী হীরু-দা এসে মহা পেড়াপিড়ী করে তাকে থিয়েটারে টেনে নিয়ে গেল!

শচী প্রথমটা যেতে চায়নি; তার আপত্তি ছিল স্ত্রীর জন্যে। 'কচি ছেলে নিয়ে বিদ্যুৎ একা থাক্‌তে পার্ব্বে না; ঝিয়ের দেশ থেকে কে আপনার লোক এসেছে,—সে গেছে তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে; কখন আস্‌বে তার ঠিক নেই; চাকরটাও আজ ক'দিন হল জ্বর হ'য়ে বাড়ী গেছে; সুতরাং তার যাওয়া অসম্ভব।'

তখন হীরু-দা ধরে বস্‌লেন—"তোমার স্ত্রীকেও নিয়ে চল।"

এই রাত্রে শীতে, হিমে কচি ছেলে নিয়ে বাইরে বেরুলে, পাছে ঠাণ্ডা লেগে খোকার কোন অসুখ-বিসুখ হয়, এই ভয়ে বিদ্যুৎ কিছুতেই যেতে চাইলে না, তবে শচীকে তখনই যাবার হুকুম দিলে। শচী কিন্তু যেতে ইতস্ততঃ কর্‌তে লাগল। "তাই ত'—একলা থাক্‌তে পার্ব্বে কি!—বাড়ীতে কেউ রইল না—"

বিদ্যুৎ হাস্‌তে-হাস্‌তে খোকাকে দেখিয়ে বল্‌লে, "কেন থাক্‌বে না? এই ত একজন মস্ত পুরুষমানুষ বাড়ীতে রইল! তুমি যাও, কিন্তু বেশী রাত কোর না; কি জানি, যদি ঝি মাগী না আসে!"

অগত্যা শচীকে শেষটা সকাল-সকাল ফিরে আস্‌বার করারেই হীরু-দার সঙ্গে যেতে হল।

ওরা যাবার একটু পরেই বাড়ীর সেই 'মস্ত পুরুষমানুষটি' মায়ের কোলের ভিতর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। ছেলেকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ খোকার পশমের মোজার বাকিটুকু বুনে শেষ করে ফেল্‌লে। তার পর "বিন্দুর ছেলে" বইখানা টেনে নিয়ে খোকার পাশে শুয়ে পড়ল।

২

শচীর শোবার ঘরের এক কোণে মার্ব্বেল পাথরের টেবিলের ওপর বড় ফ্রেঞ্চ ক্লকটায় 'টুং টাং' করে যখন রাত্রি সাড়ে-বারটা বাজ্‌তে সুরু হল, শীতের কুয়াসা-ঢাকা, কন্‌কনে ঠাণ্ডা রাত তখন সমস্ত সহরটাকে প্রায় নিস্থতি ক'রে ফেলেছে! গাঢ় অন্ধকারে গলির মোড়ের গ্যাসের আলোগুলো পর্য্যন্ত ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে। ঠিক সেই সময় নিঃশব্দে নীচের তলার জানালার গরাদে ভেঙ্গে একটা দুর্দ্ধর্ষ জোয়ান লোক চোরের মতন আস্তে-আস্তে পা টিপে বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌ল।

লোকটা আর কেউ নয়, সেই নামজাদা গুণ্ডা—খাঁ আব্বাস্‌। কতকগুলো বড়-বড় ডাকাতির জন্যে পুলিশ তার পেছনে লেগে আছে, কিন্তু কিছুতেই তাকে ধর্‌তে পাচ্ছে না। এই জন্যে আব্বাসের আর একটা নাম রটে গেছে 'খলিফা'! তবে পুলিশের

কড়াক্কড়িতে খলিফার দলটা আজকাল একেবারে ছোড়ভঙ্গ হয়ে গেছে।

এদের বাড়ীখানার উপর আব্বাসের অনেকদিন থেকেই নজর ছিল। বাবু বড়লোক, জমীদারের জামাই; বাড়ীতে লোকজনও কম; এখানে একদিন সুবিধে বুঝে ঢুক্‌তে পার্‌লে যে বেশ মোটা রকম কিছু পাওয়া যাবে, এ খবরটা সে আগেই জেনে রেখেছিল; সুতরাং আজকের এমন নিরাপদ সুযোগটা সে কিছুতেই ছাড়তে পাল্লে না।

বরাবর বাড়ীর ভেতর ঢুকে, ঘটি-বাটি-থালা-বাসন—যা-কিছু নীচের তলায় ছিল, সমস্ত সংগ্রহ করে গায়ের কাপড়খানিতে বেঁধে সিঁড়ির নীচেয় রেখে আব্বাস নির্ভয়ে উপরে উঠে গেল। যে ঘরটায় শচীর লোহার সিন্দুক, বিদ্যুতের হীরে-জহরত, শাল-দোশালা, জরী-বারাণসী, রূপোর বাসন ইত্যাদি—খলিফা আব্বাসকে সে ঘর খুঁজে বার করতে বিশেষ কষ্ট পেতে হল না। একটু জোরে গোটাকতক মোচড় দিতেই, দরজায় আঁটা লোহার তালা-চাবীটা আব্বাসের বজ্র-মুঠোর ভেতর এলিয়ে গেল।

ঘরে ঢুকে দরজাটি ভেজিয়ে দিয়ে, আব্বাস স্বচ্ছন্দে ঘরের ইলেক্‌ট্রিক্‌ আলোটা জ্বেলে দিলে;—জানে বাড়ীতে একলা একটা মেয়ে আছে বই ত নয়,—সে আর তার মতন একটা দুর্দ্দান্ত অসুরের কি কর্ব্বে? ঠিক আলোর নীচেই দেয়ালের ধারে একটা কাঠের সিন্দুক বসান ছিল, আব্বাসের আগেই সেইটের ওপর

নজর পড়ল। কোমরপেটি থেকে একটা যন্ত্র বার করে সিন্ধুকের ডালাটার নীচেয় দু'একটা চেপে চাড়া দিতেই, ডালাটা ক্রমশঃ ছেড়ে গেল। আস্তে-আস্তে সেটিকে তুলে ধর্‌তেই, আব্বাসের চোখের সাম্‌নে এক সিন্ধুক রূপোর বাসন ইলেক্ট্রিক্‌ আলোয় চক্‌চক্‌ করে উঠলো!

একটা আরামের নিশ্বেস ফেলে আব্বাস কাঁধের গামছাখানা ঘরের মেজেয় বিছিয়ে ফেল্লে। তারপর একটী-একটী করে রূপোর বাসন সিন্ধুকের ভেতর থেকে বা'র করে তার ওপর জড় করতে লাগ্‌ল। মোটা-মোটা, ভারি-ভারি চাঁদির আস্‌বাব হাতে ঠেক্‌তেই আব্বাসের প্রাণে যা' স্ফূর্ত্তি হ'তে লাগ্‌ল, সেটা তার সেই সময়ের প্রফুল্ল চোখ দুটো দেখলে সবাই বুঝতে পারতো।

৩

সিন্ধুক প্রায় সাবাড় হ'য়ে এসেছে; আব্বাস তার ডোরাকাটা চৌখুপী গামছাখানার দিকে চেয়ে দেখছে—আর তাতে ধরবে কি না—এমন সময় সজোরে দুই দরজা হাট ক'রে খুলে, একটা সতর-আঠার বছরের মেয়ে পাগলের মত ছুটে সেই ঘরে ঢুক্‌লো।

আচম্‌কা মেয়েটা ঢুক্‌তেই আব্বাসের মতন খলিফার হাত থেকেও সিন্ধুকের ডালাটা ধড়াস্‌ করে পড়ে গেল। ফস্‌ করে কোমরের পাশ থেকে একখানা প্রকাণ্ড ছোরা বার করে আব্বাস

সোজা হয়ে দাঁড়াল। মেয়েটা তার দিকেই এগিয়ে আস্‌ছে দেখে, ছোরাখানা তুলে, খুব চোখ রাঙিয়ে মেয়েটাকে শাসিয়ে দিলে যে, আর এক পা এগুলেই এই ছোরা তার বুকে বস্‌বে!

মেয়েটা ভয় পাওয়া চুলোয় যাক্—বরং হাঁফাতে-হাঁফাতে বল্‌তে লাগল, "ওগো! তোমরা শীগ্‌গির এস একবার—আমার খোকা কেন অমন কচ্ছে?" আব্বাস এবার ছোরাখানা উঁচিয়ে মেয়েটার দিকে হুম্‌কে তেড়ে এল—ধমক্ দিয়ে বল্লে, "খবরদার্—চেঁচালেই খুন কর্ব্ব!"

মেয়েটার তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই! আব্বাসকে এবার দু'এক পা পেছু হঠে যেতে হ'ল! একটু আশ্চর্য্য হয়ে মেয়েটার দিকে ভাল করে চাইতেই দেখলে, তার দু'টো বড়-বড় জলভরা সকাতর চোখের করুণ মিনতি-পূর্ণ দৃষ্টি আব্বাসের মুখের ওপর এসে পড়েছে! ইলেক্‌ট্রিক্ লাইটের সমস্ত আলোটা তখন মেয়েটার মুখময় ছড়ান। আব্বাস তেমন সুন্দর মুখ জীবনে কখনও দেখেনি! তার চোখের পলক পড়তে-না-পড়তে মেয়েটা তার সেই লম্বা-চওড়া, কাদা-মাখা পা'দুখানা একেবারে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে, কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলতে লাগল, "ওগো! তোমার দু'টী পায়ে পড়ি, আমার ছেলে বাঁচাও!"

খলিফা খাঁ আব্বাস অবাক্!—প্রবল পুত্র-স্নেহের অভেদ্য কবচে ঢাকা এই মেয়েটির কাছে দুর্দ্ধর্ষ আব্বাস খাঁর সমস্ত ভীতি-প্রদর্শন এত সহজে ব্যর্থ হয়ে গেল দেখে, জীবনে আজ এই প্রথম যেন

নিজেকে তার একান্ত অপদার্থ বলে মনে হ'ল!—ছেলের প্রাণের আতঙ্কে বিহ্বলা জননীর কাতর চোখ-মুখের সেই করুণ কাকুতি সহসা আজ একটা অনেক দিনের নিদারুণ স্মৃতি নিয়ে এমন জোরে, এমন স্পষ্ট হয়ে আব্বাসের বুকের ভেতর ঠেলে উঠলো যে, সেই পাথরের মতন শক্ত বুকের মাঝখানটা আজ একেবারে ফেটে চৌচির হয়ে গেল!

সে আজ বিশ বছর আগের কথা—যখন তার দরাজ বুকখানা একদম তাজা, কাঁচা ছিল; তখন আব্বাসের মত পরোপকারী, জোয়ান ছোক্‌রা কোন পাড়ায় ছিল না। তার পর হঠাৎ এক দিন উপর্য্যুপরি ক'টা অসহ্য আঘাতে সেই ছাতি একেবারে পিষে, থেঁতলে, গুঁড়ো হয়ে গে'ছল! সে দিন ভীষণ প্লেগের মুখে—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে—তার জানের জান ছেলেমেয়ে দু'টিকে, তার দিলকলিজার বিবিকে, একটার পর একটা, একলা গিয়ে মাটির নীচে পুঁতে আস্‌তে হয়েছিল! সে দিন মানুষের নিমক্‌হারামী—আল্লার অবিচার—এই সব ভাবতে-ভাবতে তার নিজের হাতে কাটা সেই পেয়ারের কবর-কটিতে মাটি চাপা দিতে-দিতে সেই যে তার বুকের ওপর মাটি চাপা পড়েছিল, সেই মাটি তার জীবনের সমস্ত রসকস টেনে, শুষে নিয়ে, তার সমস্ত প্রাণটাকে পাথরের মত কঠিন করে, তাকে মরিয়া করে ছেড়ে দিয়েছিল।

আরও কত পুরোনো কথা—সুখে-দুঃখে-জড়ান কত বিস্মৃত ঘটনা—বায়োস্কোপের ছবির মত আব্বাসের চোখের সামনে দিয়ে

ঘূরে গিয়ে, তাকে আত্মহারা করে তুল্‌তে লাগল! ব্যাকুল বিদ্যুৎ তখন ব্যস্ত হয়ে আব্বাসের হাত ধরে খোকার ঘরে টেনে নিয়ে চল্‌ল!—

স্প্রীংয়ের খাটের ওপর বড় বিছানা। তারই মাঝখানে একটী ছোটখাট রংচংএ বিছানায় কুঁদফুলের কুঁড়ির মত একটী ধব্‌ধবে কচি ছেলে কি যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণায় হাত পা ছুঁড়ছে! তার দুধে মুখখানি একেবারে রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠেছে—চোখ দু'টি উল্‌টে রয়েছে—পেট ফুলে-ফুলে ঘন-ঘন সজোরে নিশ্বাস পড়ছে!

খোকার অবস্থা দেখে ঝরঝর করে বিদ্যুতের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল!—"ওগো! কি হবে? দেখ না, বাছা আমার এখনও যে কেমনতর কচ্ছে! তুমি শীগ্‌গির যাও, একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে এস—উনি থিয়েটারে আছেন—ওঁকে আগে খবর দাও—আমাদের ঝিয়ের দেশের লোকের বাসা চেন?"

আব্বাস একটা অস্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠে ধমক্ দিয়ে বিদ্যুতের এই অসম্বদ্ধ প্রলাপ বন্ধ করে, তাকে চট্ করে এক লোটা জল আন্‌তে হুকুম করলে;—বিদ্যুৎ তখনি বিদ্যুতের মত ছুটে চলে গেল।

আব্বাস একদৃষ্টে ছেলেটির দিকে চেয়ে আছে;—এই ননীর দলার মত তুল্‌তুলে এতটুকু ছেলেটির এই বুকফাটা যাতনা দেখে, তার সমস্ত কঠোর প্রাণটা আজ সমবেদনায় টন্‌টন্ করে উঠ্‌তে লাগল;—"ছুঁড়ীর জল আন্‌তে এত দেরী হচ্ছে কেন?"—ব্যস্ত

হয়ে আব্বাস জলের সন্ধানে ঘরের চারদিকে চাইতেই, তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি খাটের নীচে জলচৌকীর ওপর—মুখে-গেলাস-ঢাকা একটী কুঁজোর ওপর গিয়ে পড়ল! ধাঁ করে তখনি কুঁজোটা শোলার মত বাঁ হাতে তুলে নিয়ে আব্বাস খোকার চোখেমুখে ক্রমাগত সেই ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগল!

খানিক পরে সেই শীতেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়ে বিদ্যুৎ যখন শুক্‌নো মুখে ফিরে এসে হতাশ ভাবে বললে, "ওগো! একটাও যে ঘটি-বাটি পাচ্ছিনি! কি হবে? কিসে করে জল আনবো?"—আব্বাস সে কথা শুনে, অমন বিপদের মাঝখানেও মনে-মনে না হেসে থাক্‌তে পারলে না! এদের ঘটি-বাটিগুলো যে সমস্ত আগেই সে চাদরে বেঁধে সিঁড়ির নীচে রেখে এসেছে!

বিদ্যুৎকে অভয় দিয়ে খোকার মাথায় পাখার বাতাস করতে ব'লে, আব্বাস নিজের পরণের লুঙ্গীর একটা কোণ ছিঁড়ে ফেলে, খোকার কপালে একটা জলপটি বসিয়ে দিলে; আর ক্রমাগত একুটু-একটু ক'রে চোখে-মুখে জলের ছাট্ দিতে লাগল!

মিনিট পাঁচ সাত পরেই আস্তে-আস্তে খোকার নিশ্বেসটা বেশ সরল হয়ে এল,—হাত-পায়ের খিঁচুনি ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে গেল, চোখের তারা নেমে এসে দৃষ্টি বেশ স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াল। তারপর একেবারে সাম্‌লে উঠে পুট-পুট করে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগল। সামনেই মাকে দেখতে পেয়ে, এক গাল হেসে, ছোট-ছোট, মোমে-গড়া নিটোল হাত দু'খানি মায়ের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

বিদ্যুৎ কখন নিজের অজ্ঞাতসারে হাতের পাখা নাড়া বন্ধ করে, একেবারে অসীম আগ্রহে সন্নত হয়ে, একদৃষ্টে খোকার মুখের এই সুন্দর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছিল। চাঁদমুখের টোল-খাওয়া দু'টি টোপা গালে হাসির সঙ্গে সঙ্গে যখন ডালিম-দানার মত সেই টুক্‌টুকে তাজা রংটুকু ফিরে এল,—বিদ্যুৎ একেবারে দু'হাত বাড়িয়ে, খোকাকে তার ব্যগ্র ব্যাকুল বুকের ওপর টেনে তুলে নিলে! কত ভয়, কত দুর্ভাবনার দুর্ব্বহ পাহাড় নিমেষে যেন তার বুকের ওপর থেকে গলে জল হয়ে নেমে গেল! আশঙ্কায়, উদ্বেগে বিবর্ণ জননী যখন হারানিধি ফিরে পেয়ে, সেই বুকজুড়োন ধনের টুক্‌টুকে মুখখানিতে বার বার চুমু দিতে লাগলেন,—তরুণী মায়ের মুখময় যেন দুধে-আলতার রাঙা ছোপ ধরে যেতে লাগল! পেটুক খোকন সুযোগ বুঝে তখন মায়ের 'মেন্দু' খেতে সুরু করে দিলে।

মাতা ও পুত্রের এই নিবিড় স্নেহ-মিলনের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে সেই অতি দুর্দ্দান্ত কঠোর আব্বাসের পাথরপানা ছাতিখানা আজ যেন গলে গেল—গলে গেল! বহুদিনের মাদক-দ্রব্য-সেবনে বিবর্ণ শুষ্ক চোখ দুটো বিশ বছর পরে আজ আবার জলে ভরে উঠে টস্-টস্ করতে লাগল!

৫

বিদ্যুৎ যখন সুস্থির হয়ে তার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য এই নিশীথ আগন্তুকের দিকে ফিরে চাইলে, আব্বাসের বাইরের চোহারা তখনই যেন সর্ব্বপ্রথম সুস্পষ্ট হয়ে তার চোখের সামনে পড়ল! বিশ বছরের অসহ্য অত্যাচারে তার সেই বাইরের মূর্ত্তি এমনই ভয়ানক হয়ে উঠেছিল যে, বেচারী বিদ্যুৎ দেখবামাত্র তার পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্য্যন্ত ঘন-ঘন শিউরে উঠল!

অন্য কোনও দিন, অন্য কোনও সময় বাড়ীর ভিতর হঠাৎ দোতলার ঘরের মাঝখানে এই ভীষণ মূর্ত্তিটিকে দেখলে বিদ্যুৎ নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে পড়তো; কিন্তু আজ সে জ্ঞান হারালে না। আজ যে এই যমদূতের মত মানুষটাই তার প্রাণের 'দুলাল'কে সদ্য যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছে!

আব্বাসের গলায় কালো-কারে-বাঁধা একটা রূপোর তিন-কোণা পদক ছিল। ইলেকৃট্রিক্ লাইটে সেটা চক্‌চক্ করছিল। খোকা তার মায়ের কোল থেকে মিট্‌মিট্ করে এই নতুন লোকটির গলার এই অপরূপ সামগ্রীটি এতক্ষণ একদৃষ্টে দেখ্‌ছিল। হঠাৎ সেটা ধরবার লোভ আর সামলাতে না পেরে, তিনি মায়ের কোল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বিদ্যুৎ খোকার এই আকস্মিক লম্ফ প্রদানের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না—সুতরাং খোকাবাবু

লাফ দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই মায়ের কোল থেকে খসে পড়লেন —আর একটু হলেই পাথরের মেঝের ওপর পড়ে মাথাটি গুঁড়ো হয়ে যেত ; কিন্তু তার আগেই আব্বাসের মজবুত লম্বা হাত দু'টো চক্ষের নিমেষে খোকাকে লুফে নিলে !

এই একমুঠো ফুলের মত নরম তুল্‌তুলে ছেলেটিকে বুকে করে আব্বাসের অনেক দিনের দগ্ধ প্রাণটা আজ যেন কি অগাধ আরামে—জুড়িয়ে গেল ! শতবর্ষের খরতপ্ত বালুকাময় মরুভূমি নিমেষে যেন কার যাদু-মন্ত্রে স্নিগ্ধ শিশিরসিক্ত শ্যাম প্রান্তরে পরিণত হয়ে গেল !

একটানে নিজের গলা থেকে পীরের পদকখানা খুলে নিয়ে আব্বাস হাসতে-হাসতে খোকার গলায় পরিয়ে দিলে ! বারবার নাচিয়ে, দুলিয়ে, কাঁধে-পিঠে চড়িয়ে আব্বাসের সে কি প্রচণ্ড আদর ! বিশ বছর পরে তার বুকের পাথর ঠেলে বাৎসল্যের স্নেহ-নির্ঝর আজ যে আবার পরিপূর্ণ বেগে উথলে উঠেছে ! দুষ্টু ছেলেটাও এই দুরন্ত আদরে উৎফুল্ল হয়ে, হেসে একেবারে লুটোপাটি খেয়ে তার সঙ্গে খেলা করতে লাগল !—আব্বাসের মুখে হাসি, চোখে জল ! কেবলই ঘুরে ফিরে তার মনে পড়তে লাগল, এমনই আর একটা কচি ছেলের মুখ !—আব্বাস উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো, আবদুল ! আবদুল ! এ যে ঠিক আমার সেই আবদুল ! কেয়া তাজ্জব ! কচি ছেলেগুলো কি জগতে সব একজাত !

৬

নগদ টাকা-কড়ি, সোণা-রূপো, হীরে, জহরত—যা-কি তাদের পুঁজিপাটা ছিল, একখানি বড় ট্রে করে সর্ব্বস্ব সাজিয়ে এনে বিদ্যুৎ যখন আব্বাসের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল—আব্বাস সে ট্রেখানা দেখেই—খুনী যেমন সহসা অর্দ্ধরাত্রে হতব্যক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি দেখলে চম্‌কে উঠে—তেমনি করে চম্‌কে উঠে, খোকাকে খাটের ওপর বসিয়ে দিয়ে, তীরের মত ছুটে পালিয়ে গেল! যেতে-যেতে যেন জড়িয়ে-জড়িয়ে বলে গেল, "না—না, আর আমি ওসব ছোঁব না—!"

বিদ্যুৎ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্!—মাকে অন্যমনস্ক দেখে খোকা যখন আব্বাসের গলার সেই "ধুক্‌ধুকি"খানা মুখে পুরে তার আস্বাদ গ্রহণের চেষ্টায় উদ্যত, ঠিক সেই সময় থিয়েটার থেকে ফিরে এসে হাসতে-হাসতে শচী জিজ্ঞাসা করলে, "সমস্ত রাত সদর দরজা খুলে রেখে আমার জন্য জেগে বসে আছ বিদ্যুৎ? তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি আর হবে না? যদি একটা চোর আস্‌তো, তা হলে—?"

গোলাপের জন্ম

(গ্রীষ্টীয় পৌরাণিক কাহিনী)

রোজেতা কৃষকদের কন্যা। এক বৃদ্ধা পিতামহী ব্যতীত ইহ সংসারে তাহার আপনার বলিবার আর কেহ ছিল না। রোজেতার মুখখানি অতি সুন্দর। কালো কালো ডাগর দু'টা চোখের তারা; ফুলের পাপড়ীর মত ক্ষীণ দু'খানি অধরপুট। সুচিকন রেশমী চুল তাহার সুন্দর মুখখানি বেষ্টন করিয়া বক্ষে ও পৃষ্ঠে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

রোজেতা প্রতিদিন ঝরণায় জল আনিতে যাইত। একদিন সে তাহার পূর্ণ কুম্ভ লইয়া ঝরণার তীরে একটু বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় দ্রুত অশ্বারোহণে এক সুকুমার যুবক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রোজেতার নিকট তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একটু জল চাহিলেন। রোজেতা তৎক্ষণাৎ অতি যত্নের সহিত আপনার পূর্ণ কলস হইতে ঝরণার সেই স্বচ্ছ শীতল জল অঞ্জলি ভরিয়া তাঁহাকে পান করাইল।

তৃষ্ণার্ত্ত যুবক সেই দেশের রাজকুমার; তিনি রোজেতার এই সরল শিষ্ট ব্যবহারে ও তাহার অপূর্ব্ব রূপমাধুরীতে একান্ত মুগ্ধ হইলেন; রোজেতার সেই বারিপূর্ণ প্রস্তরকুম্ভ আপনি বহন করিয়া

তাহাদের কুটীরে পৌঁছাইয়া দিলেন। রোজেতা এজন্য অতি বিনীত কণ্ঠে কুমারকে বহু ধন্যবাদ দিল।

কুমার গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু রোজেতাকে আর ভুলিতে পারিলেন না। রোজেতার কোমল কণ্ঠের সুমিষ্ট ধন্যবাদ কুমারের কানে যেন বীণার মত নিয়ত বাজিতে লাগিল। শরতের স্নিগ্ধ সন্ধ্যার অস্ফুট চন্দ্রালোকে, প্রকৃতির শ্যাম শোভায় সুশোভিত কলস্বনা নির্ঝরিণীর তটে, প্রথম-যৌবন-স্পর্শে-সমুজ্জ্বল যে এক রূপসী কৃষক বালিকাকে তাহার প্রস্তরকুম্ভ লইয়া ধূসর শিলাতলে অপেক্ষা করিতে দেখিয়াছিলেন, কুমার সে অভিনব চিত্রখানি কিছুতেই তাঁহার চিত্তপট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলেন না।

তারপর প্রতিদিনই যুবরাজকে সেই নির্ঝর সমীপে দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি রোজেতার নিকট বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার সহিত গল্প করিতেন। বালিকার সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইতেন। রোজেতার বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও তাহার জলের কলস প্রতিদিনই তাহাদের কুটীরপ্রাঙ্গণে পৌঁছাইয়া দিতেন। ক্রমে তিনি রোজেতার পিতামহীর সহিত পরিচিত হইলেন এবং বৃদ্ধাকে তাহার মনের মত কথা বলিয়া খুসী করিতে লাগিলেন। এই রকমে দিন যায়।

কিছুদিন পরে রাজকুমার একদিন রোজেতার পিতামহীকে জানাইলেন যে তিনি বৃদ্ধার ঐ ভ্রমরনয়না নাতিনীটীকে অত্যন্ত ভালবাসিয়াছেন এবং তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। বৃদ্ধা

শুনিয়া অত্যন্ত খুসী হইল এবং তাহার নাতিনী যদি প্রস্তুত থাকে তবে তাহার নিজের এ বিবাহে কোন অমত নাই জানাইল। রোজেতা কিন্তু এই নব পরিচিত যুবককে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। সে তাহাদের সেই দ্রাক্ষাপত্রাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র কুটীর-খানিকে আর তাহার বৃদ্ধা পিতামহীকে এতদূর ভালবাসিত যে তাহাদের পরিত্যাগ করিয়া সে কোথাও যাইতে রাজি নহে।

যুবরাজ তখন আপনার প্রকৃত পরিচয় দিলেন। তিনিই সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী; রোজেতাকে দেশের রাণী করিবেন ও বিবিধ রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিবেন ইত্যাদি নানা প্রলোভন দেখাইলেন; রোজেতা তথাপি সম্মত হইল না। তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমার সংসারের মধ্যে ঐ নাতিনীটী ভিন্ন আর অন্য কোনও অবলম্বন ছিল না। সে কাহার কাছে তাহার এই অশীতিপর পিতামহীকে রাখিয়া যাইবে? সে কাছে না থাকিলে যে, তাহার ঠাকুরমার একদণ্ডও চলিবে না! রোজেতা রাণী হইবার প্রলোভন হেলায় পরিত্যাগ করিল।

যুবরাজ রোজেতার এইরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইলেন। একজন সামান্য কৃষকদুহিতা তাঁহার এই অযাচিত অগাধ প্রেম, তাঁহার রাজসিংহাসনের অর্দ্ধাংশ এত অবহেলার সহিত উপেক্ষা করিল! রাজকুমার ইহাতে আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন এবং এই অপমানের সমুচিত প্রতিশোধ লইবেন স্থির করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

তারপর কিছুদিন যায়। রোজেতা এখন নিজেই আপনার জলের কলসটা বহিয়া একাকী বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। পথে আসিতে আসিতে এক-একদিন সেই অজ্ঞাত যুবরাজকে তাহার মনে পড়ে ; সেদিন তাহার কক্ষের সে পাষাণ কলসটি যেন কিছু অধিক ভারি বলিয়া মনে হয়। রোজেতার ক্ষীণ কটিতট সেদিন সে পূর্ণকুম্ভের গুরুভার যেন আর বহন করিতে চায় না !

একদিন রোজেতা এইরূপ কাতরভাবে তাহার জলের কলস বহিয়া কুটীরে ফিরিতেছে। সেদিন ঝরণায় তাহার একটু অধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল ; ভরা সন্ধ্যায় নিবিড় অন্ধকার তখন চারিদিকে ঘনাইয়া উঠিতেছে—এমন সময় জনকয়েক বলিষ্ঠ লোক হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া রোজেতাকে ধরিয়া লইয়া গেল। রোজেতা কত কাঁদিল, কত চীৎকার করিল, কিন্তু কেহই তাহার উদ্ধারের জন্য আসিল না।

রোজেতাকে যাহারা লইয়া গেল তাহারা সেই যুবরাজের অনুচর। রোজেতাকে আনিয়া তাহারা যুবরাজের প্রাসাদের এক সুদৃঢ় কক্ষে বন্দিনী করিয়া রাখিল। যুবরাজ নানা উপায়ে তাহাকে বিবাহে সম্মত করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, রোজেতা কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। তখন কুমারের অনুচরেরা তাহার উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিল, রোজেতা নীরবে তাহাদের সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া রহিল। তখন সেই নিষ্ঠুর অনুচরবর্গ নিরুপায় হইয়া রোজেতাকে নগরের ধর্ম্মমন্দিরে লইয়া গেল ও বহু

নগরবাসীকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া রোজেতার নামে একটা অপনেয় মিথ্যা কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া দিল। ধর্ম্মমন্দিরের পুরোহিতেরা রোজেতার অপরাধের বিচার করিলেন এবং তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া—জীবন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিতে আদেশ দিলেন।

যেদিন রোজেতা অগ্নিতে দগ্ধ হইবার জন্য নগরের মধ্যস্থলে আনীত হইল সেদিন যাবতীয় নগরবাসী সেই বীভৎস দৃশ্য দেখিবার জন্য সেখানে সমবেত হইয়াছিল। চারিপার্শ্বে শুষ্ক কণ্টকতরু সজ্জিত করিয়া রোজেতাকে তদুপরি দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পুরোহিতের দল তখনও রোজেতাকে তাহার অপরাধ স্বীকার করিবার জন্য আদেশ করিতেছেন। রোজেতা স্থির অবিচলিত কণ্ঠে তখনও বলিতেছে "ঈশ্বর জানেন, আমি নির্দ্দোষী! আমি কোনও অপরাধে অপরাধী নহি।" কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিবার জন্য অনেকের হস্তের দীর্ঘ মশালগুলা তখন প্রজ্বলিত হইয়াছে। পুরোহিতেরা শেষবার রোজেতাকে তাহার অপরাধ স্বীকার করিবার সুযোগ দিলেন—রোজেতার মুখে তখনও সেই এক কথা, যে, সে নির্দ্দোষী। নিষ্ঠুর পুরোহিত-সম্প্রদায় তখন রোজেতাকে মহাপাপীয়সী স্থির করিয়া তাহাকে বহু অভিসম্পাত দিলেন ও সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে দগ্ধ করিবার আদেশ দিলেন।

ধূ ধূ করিয়া রোজেতার চারিপার্শ্বে রাশীকৃত শুষ্ক কাষ্ঠ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল! অগ্নির ভীষণতার সহিত সহস্র নগরবাসীর

একটা পৈশাচিক অট্ট উল্লাস-রোল মিশিয়া চারিদিকে একটা বিকট প্রতিধ্বনি তুলিল!

কিন্তু সে প্রলয়ধ্বনি দিগন্তে বিলীন হইতে না হইতে উন্মত্ত জনতার শ্রবণ-কুহরে যেন সহসা স্বর্গের কোন অশ্রুতপূর্ব্ব বীণা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল! সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল অগ্নির লেলিহান শিখার মধ্যে দাঁড়াইয়া নির্ব্বিকার রোজেতা যুক্ত করে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে জননী মেরীর স্তুতিগান করিতেছে!

"মাগো! জগজ্জননী! এ নিখিল-বিশ্ব-রচয়িতা ধাতার ধাত্রী তুমি!—তোমার অজানিত কি দোষ আছে মা?—তোমার ঐ দু'টী রাঙ্গা চরণতলে নিত্য চন্দ্র সূর্য্য উদিত হয়! তোমার ঐ কনকপ্রতিমা ঘিরিয়া ঘিরিয়া সপ্ত গ্রহতারা নৃত্য করে!—তোমার অগোচর কি পাপ আছে জননী? তুমি ত জান গো মা! তোমার সন্তান সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী! তবে এস মা! নেমে এস! সন্তানকে অভয় দাও! এই ভীষণ অনলতাপ অপেক্ষাও অসহ্য কলঙ্কভার হ'তে তোমার নিরপরাধিনী কন্যাকে রক্ষা কর জননী!"

তখন প্রবল বায়ু বহিতেছিল। কোটী কোটী অগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছিল। যাহারা নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, অগ্নির উত্তাপ বৃদ্ধি হওয়ায় তাহারা ক্রমে দূরে সরিয়া যাইতেছে! হৃদি-লগ্ন-যুক্তকর,—একাগ্রতায়-নিমীলিত-আঁখিযুগ—রোজেতার সেই ভক্তি-অনুপ্রাণিত সুন্দর মুখখানি অনলতাপে রক্তাভ হইয়া যেন তখন একটা অনৈসর্গিক শোভা ধারণ করিয়াছিল! চারি-

দিকের সমবেত জনতা সেই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে ক্ষণেকের জন্য তাহাদের মস্তক অবনত করিয়াছিল!

সহসা যেন কাহার মৃদু কোমল করস্পর্শে রোমাঞ্চিত হইয়া রোজেতা চক্ষু উন্মীলন করিল—সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—সুর-লোকের এক মহীয়ান্ দেবদূত তাহার পার্শ্বে নামিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিচিত্র বর্ণরঞ্জিত পক্ষ বিস্তার করিয়া—রোজেতাকে গভীর মমতার সহিত বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং তাহার বেদনাতুর আঁখিপল্লবে তদীয় স্নিগ্ধ শান্তিময় কোমল করপুট সস্নেহে বুলাইয়া দিতেছেন! হর্ষ-বিস্ময়ে পুলকিত রোজেতা অতি সঙ্কোচের সহিত একবার আপনার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—সে লেলিহান অগ্নি-শিখা আর সেখানে নাই! তৎপরিবর্ত্তে তাহার চারিপার্শ্বে বিবিধ বর্ণের এক অপরূপ স্বর্গীয় কুসুমরাশি স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছে! আর তাহারই বিচিত্র সৌরভে দশ দিক আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে!

সেদিন সেই প্রথম গোলাপ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিল! সেই প্রথম সেদিন বিশ্বমানব ভক্তের পবিত্র আত্মার মত স্নিগ্ধ অভিরাম গোলাপ কুসুমের দিব্য সৌরভের আঘ্রাণ পাইল! রোজেতার নামে তাহার নাম হইল রোজ!

সমাপ্ত